নারী দিবসের বসন্ত শুভেচ্ছা

এখন ডুয়ার্স

মার্চ ২০১৯। ২০ টাকা

শ্রীমতির চোখে শ্রীমতি
রাখি পুরকায়স্থ

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা
স্মৃতিচারণে ডুয়ার্সের
একমাত্র নারী বিধায়ক
মিতালি রায়

ডুয়ার্স থেকে দূরে নয়
হলঙ্গারপার
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

গল্প। শাশ্বতী চন্দ

পাঁচ বছরের সেরা দশ 'শ্রীমতী ডুয়ার্স'

শ্রীমতী ডুয়ার্স সংখ্যা ২০১৯

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের কলমে ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী দিবসে শ্রীমতির চোখে শ্রীমতি ৬

যেখানে নারী পূজিতা নানা লোকায়ত দেবীরূপে ৮, গার্গী ১২

পাঁচ বছরের সেরা দশ শ্রীমতী ডুয়ার্স ২৪

বিশেষ প্রতিবেদন

বসন্তের পূজা পরব ব্রত প্রজনন ও সন্তানের সুস্থ জীবন কামনায় ১০

গল্প

ভদ্রলোক ১৩

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং, চতুর্থ পর্ব ১৭

পর্যটন

হলঙ্গারপার গিবন অভয়ারণ্য ২০

উত্তরপক্ষ

কালুর রিক্সা থেকে নির্মল-যান টোটো যাত্রা ২২

শ্রীমতি ডুয়ার্স

আমার মেয়েবেলা ৩১

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর ৩৩

শিলিগুড়ি ডায়েরি

বাংলাভাষার দুই মহারথীকে হারিয়ে দুঃখী শহর এগিয়ে চলেছেন ফুলেশ্বরী নন্দিনীরা ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

আনাড়ির নারী ভাবর্না ৪, রাসায়নিক রস ৩৮

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, মার্চ ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ
গৌতমেন্দু রায়

অনিবার্য কারণে নিয়মিত কলম 'খুচরো ডুয়ার্স' ও ধারাবাহিক কাহিনি 'মহারাণী কথা' প্রকাশিত হল না। আমরা দুঃখিত।

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের কলমে

নারীত্ব উদযাপিত হয় সর্বত্র নারী অসম্মানিত হয় রোজ

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনীতিতে নারীশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বিগত শতাব্দীতেই। কিন্তু নতুন শতকের প্রথম কুড়ি বছরেই রাজনীতিতে নারী যে এমন ক্ষমতাবান হইয়া উঠিবে তাহা সম্ভবত ভবিষ্যৎদ্রষ্টারাও আন্দাজ করিতে পারেন নাই। ইন্দিরা জয়ললিতা বেনজির নতুন শতাব্দীর ব্যাটন তুলিয়া দিয়াছিলেন সনিয়া মমতা মায়াবতী হাসিনার হাতে। বাংলার দুইপারে নারী শাসন একসঙ্গে দাপটে চলিবে দীর্ঘকাল তাহা কেহ কোনওদিন কল্পনা করিয়াছিল কি? দুইজনই আজকের দিনেও বিকল্পহীন, যেমন দিল্লির মসনদে তিন মন্ত্রী সুষমা-নির্মলা-স্মৃতি নিজগুণে তারকা উজ্জ্বল কোনও সন্দেহ নাই। শেষ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কাকে মাঠে নামিতে হইল, কতটা শেষ রক্ষা হইবে তাহা বলা যায় না, তবে পৌরুষের জেদ যে নারীশৌর্যের কাছে বারবার পদানত হয় তাহা তো আরও একবার প্রমাণিত হইল। জননেত্রী কিংবা গডমাদার যে নামেই ডাকা হউক না কেন, সে নারীর সামনে মাথা তোমাকে নোয়াইতেই হইবে। সেই নারীর হুঙ্কারে যখন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে পুরুষের তখত প্রাসাদ খিলান, দৈত্যভয়ে আবালবৃদ্ধ দৌড়াইয়া আসিয়া ধরে নারীর হাত, তখন তাহা জনচিত্তে উচ্চমানের আমোদ সৃষ্টি করে সংশয় নাই।

রাজনীতি হইতে মুখ ফিরাইয়া তেজের সহিত সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন অসংখ্য নারী, নিজ নিজ ক্ষেত্রে, প্রশাসনে বাণিজ্যে শিক্ষায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে খেলার মাঠে জীবনযুদ্ধে অন্তরীক্ষে সর্বত্র উৎকর্ষতা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছেন প্রতিনিয়ত। নতুন প্রজন্মের নারী দৃপ্ত চলিয়াছেন ধ্বজা উড়াইয়া, প্রজনন ও লালন করিতেছেন আগামী বিশ্বের নাগরিকদের, সদ্য কোল ছাড়া সন্তানদের ছড়িয়া দিতেছেন দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য।

আবার রাজনীতি হইতে মুখ ফিরাইয়া তেজের সহিত সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন অসংখ্য নারী, নিজ নিজ ক্ষেত্রে, প্রশাসনে বাণিজ্যে শিক্ষায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে খেলার মাঠে জীবনযুদ্ধে অন্তরীক্ষে সর্বত্র উৎকর্ষতা প্রমাণ করিয়া চলিয়াছেন প্রতিনিয়ত। নতুন প্রজন্মের নারী দৃপ্ত চলিয়াছেন ধ্বজা উড়াইয়া, প্রজনন ও লালন করিতেছেন আগামী বিশ্বের নাগরিকদের, সদ্য কোল ছাড়া সন্তানদের ছাড়িয়া দিতেছেন দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য। বিশ্বাস, হয়ত উহারা একদিন সারা পৃথিবীর নানা দেশের মাটি আনিয়া ফেলিবেন আমাদের দেশের মাটিতে। তারপর একদিন সে মাটিতে জন্ম লইবে অজস্র বোধিবৃক্ষের। পায়সান্নের থালা লইয়া আবার হাজির হইবেন সেই নারীই। যুগে যুগে যেমন নারীত্বের জয়গান গাহিয়াছে ধরণীর সন্তানেরা, আজ বিশ্বায়নের বাজারে তেমনই বিজ্ঞাপিত হয় নারীত্ব, বণিকের অন্য কোনও পথ যে খোলা নাই!

নারীত্বের উদযাপন করিয়া ক্লান্ত পৃথিবী ইহার পর নারীর অসম্মানে অগ্রসর হয়। নারীর অবমাননা চলে ঝাঁ চকচকে বেডরুমে, যাতনা চলে কর্মক্ষেত্রে, লাঞ্ছনা চলে পথেঘাটে আড়ালে আবডালে, আর অন্ধকারে চলে নির্যাতন, হত্যা। দিনরাত ধর্ষণে শ্রান্ত পশুরা ঘুমাইয়া পড়ে পরবর্তী সকালে ধোপদুরস্ত হইয়া আবার বিটিছাওয়া বাঁচাইবার প্ল্যাকার্ড হাতে লইয়া বাহির হইবে বলিয়া। তবু ব্র্যান্ড 'আজিকার নারী' দৈত্যকায় হোর্ডিং-এ স্মিতহাস্যে আপনাকে আহ্বান জানায় সাজানো দুনিয়ায়। উহার পশ্চাতে শাশ্বত নারী তাহার নির্বিকার লড়াই চালাইয়া যায়, পাঁচ গৃহের রাধুনি পরিচারিকা হইয়া সঞ্চয় করে, শিশু-পুত্র-কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠায়, ঘর বাঁধে। তাহার জন্য প্রতিদিন সূর্য উপহার পাঠায় নির্মল সকাল। পৃথিবীর যাবতীয় অসম্মান তাহার গায়ে মাখিবার কি আর অবকাশ আছে?

এখন ডুয়ার্স টিম ওয়ার্ক

একটি প্রকাশনা একটি বৃক্ষ। প্রকৃতির যাবতীয় চ্যালেঞ্জ সামলে প্রথম পাঁচ বছর বড় হওয়াটা বেশ কঠিন। আমরা আদৌ সাবালক হতে পারি কিনা তা দেখার জন্য হয়ত আরও পাঁচ বছর লাগবে। ইতিমধ্যে আমাদের নাবালকত্ব মাপ করে দিয়ে আমাদের বই ক্রেতা-পাঠক আমাদের বাঁচার জন্য কতটা রসদ যোগান দেবেন তার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা তাই আপ্রাণ বইয়ের জগতের মানুষগুলিকে কাছে পেতে চাই। ছাপা কাগজের গন্ধ চেতনাকে জাগিয়ে রাখে।

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রশান্তনাথ চৌধুরী

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

গৌতম চক্রবর্তী

নিয়মিত সাম্মানিক প্রতিবেদক

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সৌমেন নাগ

দেবপ্রসাদ রায়

নিয়মিত সাম্মানিক প্রতিবেদক

তনুশ্রী পাল

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

রাখি পুরকায়স্থ

শ্যামলী সরকার

শৌভিক রায়

হিমি মিত্র রায়

পরিবহণ

দিলীপ বরুয়া

পরিবেশনা বাণিজ্য

দেবজ্যোতি কর

কম্পিউটার বিন্যাস ও নির্মাণ

শান্তনু সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্বেতা সরখেল

ডুয়ার্স ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক ও প্রকাশক
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

আনাড়ির নারী ভাবনা

কলম সিং

ভাবিলাম, নারী দিবসে নারী মাহাত্ম্য লইয়া ফাটাইয়া লিখিব। হেনকালে জানিলাম সমিতির অন্যতম বুদ্ধিজীবী সদস্য গদাই চাটুজ্জের জটিল রোগ হইয়াছে। তিনি দিনের বেলায় নিশ্চুপ থাকেন, রাতে ঘুমের ঘোরে এমন বক্তৃতা দেন যে মোদিবাবুও ফেইলড্। রোগ তাড়াইবার নিমিত্তে তিনি ভেলোর, ব্যাঙ্গালোর, সাঁই হসপিটাল, এইমস্— কোথায় না গিয়াছেন। কী কী টেস্টই না করাইয়েছেন। কিন্তু ফল হয় নাই। শেষকালে মহাতান্ত্রিক নন্দখ্যাপার নিকট সমাধান মিলিয়াছে। তান্ত্রিক গণনা করিয়া গদাইবাবুর বউকে বলিয়া দিয়েছেন, 'আপনি স্বামিকে জাগ্রত থাকার কালে কিছু বলিবার সুযোগ দিবেন। সারা দিন আপনি স্বামিকে কিছুই কহিতে দিবেন না। বিরোধি ভাবিয়া ধমকাইয়া থামাইয়া দিবেন। সংসারদ্রোহী বলিবেন। তাহলে সে তো ঘুমের ঘোরেই বলিবে।'

তান্ত্রিকের পরামর্শে গদাইবধূ তাঁহার স্বামিকে দিনে পনের মিনিট বলিবার সুযোগ দিয়াছেন। রোগ ভাগিয়াছে। শুনিয়া আমার মহাকবি পুরন্দর ভাটের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি কবেই শ্মশানের চিতার আগুনে চারমিনার বিড়ি ধরাইয়া লিখিয়াছিলেন—

বউ যদি দিনরাত
শুধু কথা কয়
অভিঘাতে পতিদের
হৃদরোগ হয়।

অনেক ভাবিয়া, অনেক কলিকা শূন্য করিয়া সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে নারীদের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া পুরুষ জাতি জীবনে বহু চাপ লইয়াছে। যুগের পর যুগ সব কাজ নিজেরা করিতে গিয়া জট পাকাইয়া ফেলিয়াছে। এখন নারীদের উত্থান হউক। তাঁহার সব করুক! পুরুষদের কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া ঘুমাইতে দেওয়া হক। মহাকবির কথাই মনে পড়িতেছে। অহো! কী কবিতা!—

নারীগণ কাঁধে নিবে
জগতের চাপ
পুরুষের কাজ শুধু
হয়ে ওঠা বাপ!

উত্তমকুমার 'ওগো বধু সুন্দরী' বায়োস্কোপে গাহিয়াছিলেন, 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল/ কিছুই বুঝতে পারবে না/ ওরা মানে নাকো কোন ল/ তাই ওদের নাম ললনা।' হাজার কথার এক কথা! পুরুষের ল নারীরা কেন মানিবে? তাঁহাদের নিজস্ব ল হউক! তাহাতেই সংসার চলুক। বিশ্ব চলুক। বাঘ-সিংহের সংসার কি বাঘিনী-সিংহীর নিয়মে চলে না? জাতীয় পশু যদি ব্যাঘ্র হয় তবে স্ত্রীকে বাঘিনী ভাবিতেই হইবে। বাঘিনীকে স্পেস না দিলে সে আপনাকে থাবাইয়া বিপর্যস্ত করিয়া দিবে। আপনি তখন পরকীয়া করিবেন— আরেক বাঘিনীর খপ্পরে পড়িবেন। এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নারীদের হস্তে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া শান্তিতে যোগাভ্যাস করুন। ধ্যান করুন।

খোঁজ করিলে দেখিবেন যোগ লইয়া লাফালাফি পুরুষই বেশি করিয়া থাকে। বেদ-মহাভারত-পুরাণে কয়টা নারী যোগি কি সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন? সত্যযুগে নারীদের ক্ষমতা বেশি ছিল বলিয়াই পুরুষেরা ঋষি-মহর্ষি হইতেন। এখন আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের খাতির বাড়িতেছে। বহু পুরুষ গেরুয়া টিপ লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় নারীরা জাগিতেছে। পুরন্দর ভাটের অমর কবিতাটি স্মরণ করুন—

একদিন ক্ষমতায়
আসিবেন পিসী
পুরুষেরা হইবেন
যোগী আর ঋষি।

কলিকা গ্রাম কল্কে সমিতির সদস্যরা তাই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়াছি যে নারী দিবস আলাদা করিয়া পালন করিবার দরকার নাই। গোটা বৎসর ক্রমে নারীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিন নারীর হস্তে পুরুষ মহিষাসুরের ন্যায় শূলবিদ্ধ হইতেছে। নারী পুরুষের ন্যায় পাৎলুন পরিতেছে কিন্তু পুরুষের শাড়ি পরিবার দম নাই।

সুতরাং, হে পুরুষ! বাক্তল্লা ছাড়িয়া ধ্যান করিবার জায়গা অনুসন্ধান করহ! মৌন থাকা প্র্যাকটিশ করহ! ভাবা প্র্যাকটিশের দরকার নাই। ভাবিয়া কিস্যু করিতে পারিবে না। পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত কবিতায় পাওয়া গিয়াছে—

পুরুষের ভাবনায় নাহি কোন ফল।
যত ভাবে নারীদের বেড়ে যায় বল।।

আর, পুরুষগণের যাহারা রাজনীতি করিতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন 'নেতা' শব্দ তামাদি হইল বলিয়া। নেতা আর থাকিবে না। কেবল থাকিবে 'নেত্রী'। নেতৃত্ব শব্দ উঠিয়া যাইবে। থাকিবে কেবল 'নেত্রীত্ব'। পিসী না থাকিলে ভাইপো'র কী দাম?

আটুই মার্চ নারী দিবসে আসুন আমাদের সমিতিতে। বিনামূল্যে মহাতামাক পাইবেন। সেবন করিয়া যোগাভ্যাসে হাতখড়ি লইবেন। শিবনেত্র হওয়া ব্যতিত পুরুষের কিছু করিবার নাই। এদ্দিন কাব্য করিয়া বলিতেন, পুরুষকে অনুপ্রেরণা যোগায় নারী। —একালে অনুপ্রেরণা কে যোগাইতেছে? কাব্য বাস্তব হইয়াছে। পুরন্দরের পঙ্‌ক্তিও বাস্তব হইবে—

শেষের সেদিন বড়ো
ভয়ানক
পরিবর্তিত পট,
নারীগণ শুধু
কহিবেন কথা
পুরুষ স্পিক্‌টি
নট।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী দিবসে শ্রীমতির চোখে শ্রীমতি

রাখি পুরকায়স্থ

আজকের নারীকে কোন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ? কীভাবেই বা আলোর পথে নিয়ে আসা যায় পিছিয়ে থাকা বা যৌনপল্লীর মেয়েদের ও তাদের সন্তানদের ? কী চায় একজন নারী এই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় ? একজন সফল বা স্বনির্ভর নারীর ভাবনায় নানান হেনস্থা বাধা প্রতিবন্ধকতা কীভাবে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া যায় তার উপায় মেলে। আজকের শ্রীমতী খুঁজে বের করবার চেষ্টায় অবিরত মগ্ন থাকে সেই মুক্তির পথ। তাঁদের বয়ানেই জেনে নেওয়া যায় তাঁদের ভাবনা।

"পৃথিবীটা তবু একচুল এগোলো না
অনেক তো হল মানবিকতার ভাষ্য
এবার তাহলে মানবী কথাই হোক
নতুন শতকে স্বপ্ন দেখার চোখ"
— মল্লিকা সেনগুপ্ত

রক্ষণশীল মানসিকতা প্রতিবন্ধকতা নয়, মেয়েদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ

স্মিতা পাঠক, উদ্যোগপতি। বাবা-দাদা-স্বামীর সহযোগিতায় নয়, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় স্মিতা গড়ে তুলেছেন এক অভিনব ফুড চেইন ব্যবসা 'ডেলিসিয়াস'। আজ দেশের নানান প্রান্তে তাঁর ফুড কাউন্টার। অনলাইনে বুকিং করলেই ডেলিভারি বয় খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতাদের দোরগোড়ায়। বিদেশে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়া ঝকঝকে স্মার্ট স্মিতা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসই মহিলাদের ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি। তিনি বিশ্বাস করেন, আশেপাশের সমাজটা ক্রমশ পাল্টাচ্ছে। নারীদের অধিকারকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যদিও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন লিঙ্গ-বৈষম্য দোষে দুষ্ট গতানুগতিক ধারণাগুলির বশবর্তী হয়ে এই সমাজ স্মিতার ইচ্ছেগুলিকে অবজ্ঞা করেছে, তবুও সেই রক্ষণশীল মানসিকতাকে তিনি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখছেন না, বরং চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন এবং আগামীতে জীবনের লক্ষ্যপূরণের অনুপ্রেরণা বলেই মনে করছেন। কিন্তু আজও কেন বহু নারী তাঁর মত স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন না? বিষয়টি তাঁকে বড় ভাবায়।

উপকার না করতে পারলেও অন্তত মানুষের মত বাঁচতে দিন

সোমা বর্মণ, কুস্তিগির। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সোমা। রাস্তার পাশে বাবার ছিল একখানা ছোট চায়ের দোকান। বাবার পক্ষে দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ চালানো সম্ভব ছিল না। ছেলেকে যে কোনও অবস্থায় পড়াশোনা করাতেই হবে। তাই চিরাচরিত নিয়মে সোমার পড়াশোনায় ইতি টানা হল। বাবা-মা আলোচনা করলেন- 'মেয়েরা পড়াশোনা করে করবেটা কি? সেই তো হেঁশেলে গিয়ে হাঁড়ি-কড়াই ঠেলবে'। সোমার যখন ১৪ বছর বয়স, তখন ৪৫ বছরের রতন ঘোষের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর ওপর তীব্র শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হত। নির্যাতন চরমে উঠলে তিনি একদিন পালিয়ে যান। শহরের একটি বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ নেন। সেখানেই এক কুস্তি খেলার কোচের নজরে পড়েন। উত্তরণের সিঁড়ি সেখান থেকেই শুরু। আজ সোমা একজন আন্তর্জাতিক স্তরের কুস্তিগির। বহু পুরস্কার তাঁর হস্তগত। এখন নিজের একখানা কুস্তি কোচিং ইন্সটিটিউট খোলার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আর্থিক-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেয়েদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই, অভাব কেবল অর্থ, সুযোগ ও পারিবারিক সমর্থনের। তিনি বলেন, 'মেয়েদের উপকার করতে না পারলে করবেন না, অন্তত ওঁদের মানুষের মত বাঁচতে দিন'।

হাজার-হাজার আদিবাসী মেয়েদের আজও অন্ধকারে আলো দেখাবার জন্য কেউ নেই

চামেলি ওরাওঁ, আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এক প্রত্যন্ত চা বাগানের মেয়ে চামেলি। বাবা নেই। মা চা শ্রমিক। সারাদিন কাজ করলে হাতে আসে সাকুল্যে ১৩৫ টাকা। পেটের দায়ে চামেলির দাদা পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তবু হাজারো প্রতিকুলতার বেড়াজাল টপকে উচ্চ মাধ্যমিকে ৬৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করেছেন চামেলি। স্বপ্ন ছিল আইনজীবী হবেন। তবে আইন পড়ার ব্যয় বহন করবার মত অবস্থা নয় তাঁদের। কোথায় কোন কলেজে গিয়ে কিভাবে ভর্তি হতে হয় সেসবও জানেন না। এক সহৃদয় সাংবাদিক তাঁর লড়াইয়ের কথা, তাঁর স্বপ্নের কথা লিখেছিলেন স্থানীয় সংবাদপত্রে। সেই খবরে চোখে পড়ে যায় মহিমা চক্রবর্তীর। তিনি পেশায় আইনজীবী। চামেলির সাথে যোগাযোগ করেন

তিনি। একটা অচেনা মেয়ের দায়িত্ব নিতে অনেকেই তাঁকে নিরুৎসাহ করে। কিন্তু কারোর কথায় কান না দিয়ে চামেলির পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব নেন মহিমা। আজ চামেলি আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। চামেলি বলেন, 'আমার বয়সী কত আদিবাসী মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে ভিনরাজ্যে কাজের জন্য চলে গিয়েছে। তাঁরা কেউ আর বাড়ি ফিরে আসেনি। বড় শহরে কাজ দেওয়ার নাম করে দালালরা চা বাগানগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। মহিমা ম্যাডামের মত মানুষ এসে আমার জীবনটা পাল্টে দিয়েছেন, কিন্তু হাজার-হাজার আদিবাসী মেয়েরা আজও অন্ধকারে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের আলো দেখাবার জন্য কেউ নেই!'

অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার সুপ্ত মনোবাঞ্ছা থেকেই শুরু হয় কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা

সিম্মি সেন, সফটওয়্যার ডেভেলপার। মার্কিন প্রবাসী স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর, নিজের মনের মত বাঁচবার সিদ্ধান্ত নেন সিম্মি। ফিরে আসেন দেশে। সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্ট কোর্স করে গড়ে তোলেন নিজের কোম্পানি। বহু মহিলাকে চাকরি দিয়েছেন সেখানে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই পারে মেয়েদের পরাধীনতার শৃঙ্খলামুক্ত করতে। সিম্মি অবশ্য মনে করেন, 'সমাজের বহিরঙ্গে পরিবর্তন এলেও, অন্তরঙ্গে মোটেই সেভাবে পরিবর্তন আসেনি। নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে ও সফল্য অর্জনের আশায় নারীরা যখন ঘর ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখেন তখন গৃহে ও কর্মক্ষেত্রে এক অদ্ভুত লিঙ্গ-বৈরিতা সৃষ্টি হয়। কট্টর পুরুষতন্ত্র কেবলমাত্র রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরকেই নারীদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র বলে মনে করে। তাই পুরুষ প্রধান কর্মক্ষেত্রে নারীদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার সুপ্ত মনোবাঞ্ছা থেকেই শুরু হয় কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্থা!'

পড়াশোনা না শিখলে যৌনপল্লীর বাচ্চারা সমাজের মূলস্রোতে মিশতে পারে না

উমা ছেত্রী, বিউটিশিয়ান ও শিক্ষিকা। ছোটবেলার কথা এখন আর তেমন স্পষ্ট মনে নেই উমার। তাঁর বাবা ছিলেন চা বাগানের শ্রমিক। হঠাৎ করে একদিন চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাবার কাজ-কর্ম নেই, প্রায়ই রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। অকারণে তাঁর মাকে বেধড়ক মারতেন। এদিকে ঘরে খাবার নেই। মা ঝোপ-জঙ্গল থেকে লতা-পাতা তুলে আনতেন, কখনও বা এক মুঠো ভাতের সাথে লবণ। মাত্র দশ বছর বয়সে বাবা-মাকে না জানিয়েই পাশের বাড়ির দাদার সাথে একপেট খিদে নিয়ে উমা চলে এসেছিলেন কলকাতায়। সেই দাদা বলেছিল, কলকাতায় নাকি খাবারের অভাব নেই। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে সেই দাদা তাঁকে বেচে দেয় যৌনপল্লীতে! সেখানে অবাধ্য হলেই চাবুক পেটা, সিগারেটের ছ্যাঁকা, আরও কত যে অকথ্য অত্যাচার সয়েছেন উমা তার কোন ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ যেন আশার আলো হাতে নিয়ে তার ঘরে এসে দাঁড়ালো তপন দাস। খাবারের দোকানে কাজ করে তপন। উমাকে দেখে তপন হতচকিত হয়ে যায়। এত ছোট একটি মেয়ের খদ্দের সে! পরদিন সে পুলিশে খবর দেয়। বিরাট পুলিশ বাহিনী হানা দেয় সেই বেপাড়ায়। মুক্তি পান উমা। তাঁর স্থান হয় একটি বালিকা আশ্রমে। অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখে মাধ্যমিক পাশ করেছেন উমা। তারপর সরকারি স্বনির্ভর প্রকল্পের সহায়তায় বিউটিশিয়ান কোর্স করে এখন তিনি একটি ছোট বিউটি পার্লারের মালিক। সেইসাথে তিনি গড়ে তুলেছেন এক ছোট্ট পাঠশালা। ওখানে যৌনপল্লীর শিশুদের তিনি পড়ান। তিনি বলেন, 'যৌনপল্লীর বাচ্চারা সমাজের মূলস্রোতে মিশতে পারে না। মেয়েরা তাদের মায়েদের মতই দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়, আর ছেলেরা হয় মা-বোনের দালাল। আমি চেষ্টা করছি, অন্তত কয়েকটি ছেলেমেয়েকে যদি শিক্ষিত করে এই যৌনপল্লীর বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি'।

শিক্ষিত সমাজেও লিঙ্গ বৈষম্য একটুও আশ্চর্যের নয়

সুনীতা চ্যাটার্জী, স্কুল শিক্ষিকা। বিয়ের আগে থেকেই একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াতেন। ছেলের জন্মের আগে শ্বশুরবাড়ির সকলের পরামর্শে চাকরিটি ছেড়ে দেন। স্বামী বলেছিলেন, 'ক'টাকাই বা বেতন পাও?' ছেলের জন্মের পর স্বামী বললেন, 'চাকরি করে কী এমন মাথামুণ্ডু কিনে ফেলবে? তার চেয়ে বরং ঘরে বসে ছেলে মানুষ করো'! সুনীতা তেমনটাই করছিলেন। ছেলে স্কুলে ভর্তি হতেই আবার নতুন করে শিক্ষকতা করবার ইচ্ছে মাথা চাড়া দিল। স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সকলে প্রচণ্ড বাধা দিলেন। তাঁরা চান না বাড়ির বউ চাকরি করুক। 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দেখেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল- সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল কনভেন্টে পড়া উচ্চশিক্ষিতা 'ঘরোয়া' পাত্রী চাই। অর্থাৎ পাত্রী কনভেন্টে পড়া উচ্চশিক্ষিতা হলেও চাকরি করবার কথা ভাববেন না, ঘরে থাকবেন — কী বৈপরীত্য! সুনীতা এবার আর ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। এই অস্বাস্থ্যকর বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেন তিনি। আজ একটি স্কুলে পড়ান। কোর্টের আদেশে ছেলের কাস্টডি পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, 'যে সমাজে পুরুষকেই একমাত্র উপার্জনক্ষম এবং নারীকে কেবলমাত্র গৃহকর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে চূড়ান্ত লিঙ্গ বৈষম্য একটুও আশ্চর্যের বিষয় নয়!'

মেয়েরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বিয়ে নয়!

মালতী দাস, গৃহ পরিচারিকা। মালতী দাসের দুই মেয়ে। স্বামী কোন কাজ করেন না। ৫-৬ বাড়ি কাজ করে সংসারের জোয়াল টানেন একা মালতী। প্রতিদিন স্বামীর মদের খরচ যোগাতে হয়। নাহলে কপালে জোটে প্রচণ্ড শারীরিক প্রহার। তাই মাসের শুরুতে হাতে বেতন পেলে লুকিয়ে রাখেন মালতী। এভাবেই দুই মেয়ের পড়াশোনা চালাচ্ছেন। নারী স্বাধীনতা, লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ সাম্য ইত্যাদি কঠিন-কঠিন শব্দের মানে জানেন না মালতী। গত বছর ৮ই মার্চ সবিতা দিদিমণি বলেছিলেন, সেদিন নাকি নারী দিবস! মালতী জানতে চেয়েছিলেন, 'এইটা আবার কুন দিবস গো দিদি? চাল, ডাল, কাপড়-জামা ফিরি দিবো নাকি? জিনিসের যা দাম!' মাত্র ১৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের এক পাড় মাতালের সাথে বিয়ে হয়েছিল মালতীর। আসলে হতদরিদ্র মা-বাবা টাকার লোভে তাঁকে বিক্রি করেছিল ওই লোকটার কাছে। জীবন যন্ত্রণায় জর্জরিত মালতী বলেন, 'লুকজনে কয়, মাইয়া দুইটারে বিয়া দিতে। আমি সুজাসুজি কই, দিনকাল যা পড়সে, আমি ওদের পড়াশুনা করাইমু। ওরা নিজের পায়ে না দাঁড়াইলে বিয়া দিমু না'।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নারী-পুরুষ উভয়েই পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী

তিস্তা বসু, নারীবাদী লেখক। লিঙ্গ সমতার পক্ষে কথা

বলেন তিস্তা, লিখেছেন বহু বই। তিনি বলেন, 'আমাদের সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ঠাট্টা-ইয়ার্কি, গালাগালি, পোশাক নির্বাচন — জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ রাজনীতি'র শিকার নারী। যুগ-যুগ ধরে এই লিঙ্গ বিভাজনের ফলে নারীরা তাঁদের নূন্যতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। এমতাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নারীদের সসম্মানে বাঁচার অধিকারের দাবিতে ও সুদূরাতীত কাল থেকে নারীদের ওপর নেমে আসা অসাম্য, বঞ্চনা ও পণ্যায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে নারীবাদ। আমাদের সকলের জানা দরকার, নারীবাদী আন্দোলন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। কারণ, পুরুষরাই কেবল পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি নন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নারী-পুরুষ উভয়েই পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী। পুরুষতন্ত্রে বিশ্বাসী কট্টরপন্থী নারী—পুরুষদের কুশিক্ষা, রক্ষণশীলতা ও অসচেতনতার কারণেই এই লিঙ্গ অসাম্যের ধারা প্রবাহমান'। আজকের দিনের শিক্ষিত সফল নারীরাও কিভাবে এক আশ্চর্য রক্ষণশীল মানসিকতার সাথে লড়াই করছেন সেটাও তাঁর কথায় উঠে আসে। তিনি বলেন, 'সমাজের একটি বিশাল অংশ রয়েছে যা এখনও সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। আদর্শ ভারতীয় নারী বলতে তাঁরা বোঝেন, গৃহকর্মে নিপুণা, শাড়ি-গয়নায় মোড়া, 'সাত চড়ে রা কাড়ে না' এমন একটি মেয়েমানুষ। অন্যদিকে, নিজ অধিকার সচেতন, শিক্ষিত, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী নারীদের সর্বদা হীন প্রতিপন্ন করতে চায় এই সমাজ'।

এই প্রতিবেদনের সব চরিত্র কাল্পনিক। তবে বাস্তবের সাথে এর হুবহু মিল আছে, তাই জীবিত কিংবা মৃত কোন ব্যক্তি, অথবা কোন ঘটনার সাথে যদি মিল খুঁজে পান তবে তা মোটেই অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করবেন না! কট্টর পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয়, চূড়ান্ত লিঙ্গ-বৈষম্যের মধ্যে থেকেই, প্রতি বছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে নারীদের সাফল্যগুলিকে উদযাপন করা হয়। খোঁজা হয় নারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ। জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০১৯ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য - "Think equal– build smart– innovate for change"। প্রতিপাদ্যটি সেই সব উদ্ভাবনী উপায়ের দিকে আলোকপাত করে যার সাহায্যে আমরা লিঙ্গ সমতা ও নারীদের ক্ষমতায়নের পথে, বিশেষ করে নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, জনপরিষেবা এবং টেকসই পরিকাঠামোর সহজতর উপলব্ধতার ক্ষেত্রে, আরও অগ্রসর হতে পারি। আমাদের বুঝতে হবে, নারীদের সম-অধিকারের প্রশ্নটি কেবল নারীসমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বস্তুত, এতে রয়েছে নারী-পুরুষের মিলিত বিশ্বে সর্বজনীন প্রগতির প্রতিশ্রুতি। আসুন, এবারে আমরা এমন একটি ভবিষ্যত উদযাপন করি, যেখানে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অঙ্গীকার গড়ে তুলতে পারে এক সমতার বিশ্ব।

যেখানে নারী পূজিতা নানা লোকায়ত দেবীরূপে

দেবী বাড়ি মন্দিরের বড় দুর্গা

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতিতে মাতৃকাদেবী হলেন উর্বরতার প্রতীক। তবে, এই মাতৃকাদেবীর ধারণাটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেন বংশের রাজা নীলধ্বজ তাঁদের উপাস্য কামতা দেবীর নামে কামতা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার রাজধানীর নাম দেন কামতাপুর। এই অঞ্চলের মানুষ এই দেবীকে 'গোসানা' নামে উল্লেখ করেন। তাই এই কামতাপুর পরবর্তীতে গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। এখানে দেবীর কোনও মূর্তি নেই। এই দেবীর সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত লোককথা 'গোসানীমঙ্গল' বইয়ে লেখা আছে।

এই অঞ্চলের আরেকজন উল্লেখযোগ্য দেবী হলেন মা কামাখ্যা। তাঁকে নিয়ে যে লোককথা প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায়, একবার মা কামাখ্যা তাঁর মন্দিরে নাচ করছিলেন; ঠিক সেই সময়ে কোচবিহারের তখনকার রাজা নরনারায়ণ, মন্দিরের পুরোহিত কেন্দু কলাইয়ের সাহায্যে, অনুমতি না নিয়েই লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের ফাঁক দিয়ে দেবীর সেই নাচ দেখেন। এতে কামাখ্যা দেবী ভীষণ রেগে যান এবং রাজা নরনারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, আর কখনও কোচবিহার রাজবংশের কেউ যদি কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করেন, তবে পুরো রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই প্রথা মেনে কোচবিহার রাজবংশের কেউ আজও নীলাচল পাহাড়ের ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ ঢেকে রাখেন; এমনকি তাঁদের গোসানীমারির কামতেশ্বরী দেবীর দর্শন করাও নিষেধ।

তুফানগঞ্জের চামটা গ্রামে একটা কালো পাথরের টুকরোকে দেবী হিসেবে পূজা করা হয়। এই দেবীর নাম ঘূর্ণেশ্বরী। তিনি ঘূর্ণিঝড়ের দেবী নামে পরিচিত। অনেকের মতে এই কালো পাথরের খণ্ডটা আসলে কোনও প্রাচীন উল্কাপিণ্ড।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি পূজার কথা উল্লখ না করলেই নয়, তা হল শীতলা বা বুড়িমার পূজা। বসন্ত বা হাম রোগ হলে, সেই রোগের হাত থেকে বাঁচতে এই শীতলা বা বুড়িমা বা মাঠাকুরুণের পূজা করা হয়। লোকমতে জানা যায়, এই দেবী যখন প্রথম আবির্ভাব হন, তখন তিনি গায়ে হলুদ মেখে এসেছিলেন। সেই রীতি মেনে এই দেবীর মূর্তির রঙ হলুদ করা হয়। উত্তরবঙ্গের মাঘপালা গ্রাম, ছাটরামপুর গ্রাম, থ্যাটারপাট গ্রামে এই বুড়িমা বা মাঠাকুরুণের পূজা দেখা যায়।

এই অঞ্চলে প্রচলিত আরও দুটো ব্যতিক্রমী পূজা হল— সাতবইনী পূজা আর সুঙ্গাই পূজা। সুঙ্গাই মূলত পান চাষিদের দেবী। পান চাষিরাই মূলত পানের উৎপাদন বাড়াতে তাঁর পূজা করেন। লোকপুরানে পাওয়া যায়, কার্তিকের সাথে সুঙ্গাই-এর বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু পরে সেই বিয়ে ভেঙে যায় আর সুঙ্গাই লগ্নভ্রষ্টা হন। পরবর্তীতে তিনি আর কখনও বিয়ে করেন নি। কোচবিহারের বাবুরহাট গ্রাম আর তুফানগঞ্জের ধলপল গ্রামে এই দেবীর পূজা অপেক্ষাকৃত বেশি চোখে পড়ে। অন্যদিকে রাজবংশী শব্দ 'বইনী' কথার অর্থ 'বোন'। সাতবইনী বা সাতটা বোনের পূজা মূলত বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত। এই সাত বোন হলেন- ঝেটুনবিবি, আজগইবিবি, বাহরাবিবি, খড়িবিবি, আসানবিবি, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া এবং ২৪ পরগনা জেলায় পাঁচ বোনের পূজা প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে এই পাঁচ বোন হল— দুর্গা, কালী, গঙ্গা, সরস্বতী, তিস্তা। উত্তরবঙ্গের একমাত্র তুফানগঞ্জের বাঁশরাজা গ্রামে রাভা এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা মিলে 'সাতবইনী' বা সাতটা বোনের পূজা করে। এই সাত বোনের মূর্তির মধ্যে মাঝের মূর্তিটি বড় বোনের। তিন বোনের মূর্তির রঙ হলদে আর বাকি চার বোনের মূর্তির রঙ কমলা। সাতটা মূর্তিকে সাতটা আলাদা রঙের শাড়ি পরানো হয়েছে।

কোচবিহারের বানেশ্বরের কাছে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম। এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের মন্দির আছে। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এই মন্দিরের ভেতর আটটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেবী সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তির চার হাত; চার হাতে যথাক্রমে খড়্গ, কর্তরী, দর্পণ, বরাভয় দেখা যায়। এই মূর্তিকে কালী হিসেবে পূজা করা হয়।

মন্দিরের সামনেই প্রাচীর ঘেরা একটা কামরাঙা গাছ আছে। এই গাছের গোড়ায় গোলাকার একটা পাথরখণ্ড রাখা এবং ওতে মা কামাখ্যা-র নাম লেখা। এই পাথরখন্ডকেও পূজা করা হয়।

কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার বামনহাটের পাথরসোন গ্রামে ভদ্রকালী হিসেবে পূজা করা হয় মাধাইখালের কালী। এই কালী সম্পর্কে একটা লোককথা প্রচলিত আছে। একবার এক শাঁখারি শাঁখা বিক্রি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পাথরসোন গ্রামের এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লাল পাড়ের শাড়ি পরা মেয়ে এসে তাঁর কাছে শাঁখা কিনতে চাইল। শাঁখা বিক্রেতা তাকে শাঁখা দিলেন এবং দাম চাইলেন। মেয়েটি বলল, তার কাছে কোনও টাকা নেই; তাই শাঁখারি যেন সেই শাঁখার দাম তাঁর বাবার কাছে থেকে নিয়ে নেন। শাঁখারি জিজ্ঞেস করে মেয়েটিকে যে তাঁর বাবা কোথায় থাকেন। উত্তরে সে জানায় বামনহাট বাজারের কাছে যে শরৎচন্দ্র বর্মন থাকেন, তিনিই মেয়েটার বাবা। শাঁখারি সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্র বাবুর কাছে শাঁখার দাম চাইলে শরৎ বাবু বলেন যে ওনার কোনও মেয়েই নেই। এভাবে কিছু সময় কথা কাটাকাটি চলে আর তারপর শরৎবাবু শাঁখারিকে শাঁখার দাম দিয়ে দেন। এই ঘটনার অনেক পরে, যেখানে শাঁখারি প্রথম সেই লাল পাড়ের শাড়ি পরা মেয়েটিকে দেখেছিল, সেখানে ভদ্রকালীর মন্দির নির্মাণ করা হয়। সেই মন্দির মাধাইখালের কালী মন্দির নামে পরিচিত। ওই মন্দিরকে ঘিরে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে কালীপূজা উপলক্ষে মেলা বসে। প্রথা মেনে মেলায় অনেক শাঁখার দোকান বসে। রীতি মেনে বিবাহিত মহিলারা মন্দিরের সামনে নতুন শাঁখা পরেন। ১২ দিন ধরে এই কালীপূজা চলে। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, এই কালী পাটের মাটি আর তুলসী পাতা যদি খাওয়া যায়, তবে যে কোনও দেহের রোগ সেরে গিয়ে সুস্থ হওয়া সম্ভব। আরেকটি লোককথা অনুযায়ী, তুফানগঞ্জের পলিকা গ্রামের কালীগঙ্গা বিলে আগে কখনই সেরকম জল হত না। মা কালীর আশীর্বাদে সেই বিল জলে ভরে ওঠে আর মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেখানে কালী পূজা চালু করতে নির্দেশ দেন। সেই থেকে এই এলাকায় চালু হয় এই মনস্কামনা কালী পূজা। এছাড়া, কোচবিহারের দেওয়ানহাটের বালাসী গ্রামে একটা ঘটকে একটা বটগাছের নীচে বসিয়ে মাসানকালী হিসেবে পূজা করা হয়। হলদিবাড়ি ব্লকের কাশিয়াবাড়ি গ্রামে মন্দির তৈরি করে কোনও মূর্তি ছাড়াই মন্দিরের বেদীতে প্রতি মঙ্গল আর শনিবার করে দক্ষিণাকালী কল্পনা করে কালীপূজা করা হয়। এই পূজা মূর্তিবিহীন কালীপূজা নামে পরিচিত। যদিও বছরে কালীপূজার সময়ে একবার মূর্তি তৈরি করে কালীপূজা হয় সেখানে, রীতি মেনে সেই মূর্তি বিসর্জন দিতে হয় রাত থাকতে থাকতে সূর্য ওঠার আগেই। এই কালীপূজাগুলো ছাড়াও, কোচবিহারে মরিচবাড়ি গ্রামে মা কালীর একটি লৌকিক রূপ প্রত্যেক দীপান্বিতা অমাবস্যায় পূজা করা হয়। এই কালীর নাম 'শাখাতী দেবী'। এছাড়াও, প্রত্যেক ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় দিনহাটার সাহেবগঞ্জের ছিন্নমস্তাকালী পূজা এবং দিনহাটার বাউসমারী গ্রামের বাউসমারী কালীপূজা উল্লেখযোগ্য।

এ তো গেল মা কালীর নানান লোক-রূপের পূজার কথা। মা মনসা এবং বিষহরি-কেও লোকমতে কোচবিহার এবং তার আশেপাশের জায়গায় পূজা করা হয়। মা মনসা আর বিষহরি পূজা নিয়ে এই অঞ্চলে দুটো গল্প লোকের মুখে শোনা যায়—

বেহুলা যখন লক্ষিন্দরের মৃতদেহ ভেলায় ভাসিয়ে ইন্দ্রপুরী যাচ্ছিলেন, তখন নদীর এক বোয়াল মাছ লক্ষিন্দরের এক পা খেয়ে ফেলে। পরে বেহুলার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে মহাদেব নদীর সেই বোয়াল মাছের পেট কেটে লক্ষিন্দরের পা বের করে এনে, মন্ত্র পড়ে, লক্ষিন্দরের দেহে সেই পা জুড়ে দেন এবং পরে মা মনসার আশীর্বাদে লক্ষিন্দর তার প্রাণ ফিরে পান। এই ঘটনাকে মনে রেখে এই অঞ্চলে মা মনসার নাম হয় 'হাড়হাড্ডি মনসা'। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন প্রত্যেক বছর এই হাড়হাড্ডি মনসার পূজা হয়।

আরেকটি লোককথা অনুসারে, সাইটন নামে এক বন্ধ্যার বাস ছিল এই অঞ্চলে। মা মনসা একদিন সাইটন-কে গর্ভে ছেলে জন্ম দেওয়ার বর দেন এবং তার কাছে শপথ করিয়ে নেন যে, সাইটনের ছেলেদের বিয়ের সময় সাইটন যেন বিষহরি বা মনসা পূজা করেন। মা মনসার বরে সাইটনের দুই ছেলে হয়। কিন্তু সাইটন তাঁর ছেলেদের বিয়ের সময় মনসা পূজা করতে ভুলে যান এবং অভিমানী মা মনসা সাইটনের দুই ছেলেকে মেরে ফেলেন। যদিও পরে তিনি তাঁদের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে মনে রেখে রাজবংশী সমাজে আজও বিয়ের আগে মনসার পাঁচালী গাওয়ার রীতি আছে।

উত্তরবঙ্গে দুর্গা পূজার মতোই আরেকটা পূজা হল ভাণ্ডানি পূজা। এই পূজাকে নিয়েও কিছু লোককথা এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়—

প্রাচীন কালে নহুশ নামে এক রাজা দুর্গা পূজার সময়ে তার রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজা করবেন ঠিক করেন। কিন্তু পূজার সময় রাজা নিজের খেয়ালে শিকারের উদ্দেশে বেড়িয়ে যান। শিকারের আনন্দে রাজা দুর্গা পূজার কথা বেমালুম ভুলে যান। এদিকে দশমীর দিন সবাই মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে নিয়ে যায়। কিন্তু মা দুর্গা রাজার অঞ্জলি না নিয়ে ফিরতে চান না। তখন মা দুর্গা নিজেই বাঘের পিঠে চেপে বনে পাড়ি দেন এবং রাজাকে খুঁজে তার কাছ থেকে অঞ্জলি চান। রাজা এই ঘটনায় লজ্জা বোধ করেন। উনি দেবী দুর্গার কাছে ক্ষমা চান এবং সেই জঙ্গলেই মা দুর্গাকে অঞ্জলি দেন। দেবী দুর্গা খুশী হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে যান। এই ঘটনার পর থেকেই দেবী দুর্গার এই রূপকে ভান্ডানি দেবী নামে উল্লেখ করে চালু হয় ভাণ্ডানি পূজা।

আরেকটি মত অনুযায়ী, মা দুর্গা যখন দশমীর পর পৃথিবী থেকে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাণ্ডারনী। সে মাঝরাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় মা দুর্গাকে যাওয়ার পথে তিনদিন একটি গ্রামে থাকতে হয়। দশমীর পর তিনদিন ওই গ্রামের মানুষেরা মা দুর্গাকে খুশী করতে আবার মা দুর্গার পূজা করেন। ভান্ডারনী-র নামে এই পূজার নাম হয় ভাণ্ডানি পূজা।

আরেকটা গল্প এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে এই পূজা ঘিরে- দেবী দুর্গার এক বোন ছিলেন ভাণ্ডানি। মা দুর্গা পূজা পাচ্ছেন অথচ ভাণ্ডানি কোনও পূজা পাচ্ছেন না, তা দেখে ভাণ্ডানির মনে খুব দুঃখ হল। মা দুর্গা বোনের দুঃখ দেখে বোনকে পরামর্শ দিলেন যে, সে যেন দশমীর পর, একাদশীর দিন পৃথিবীতে উপস্থিত হন। ভাণ্ডানি সেই কথা মত একাদশীর দিন পৃথিবীতে উপস্থিত হলেন। এবং একাদশী থেকে পর পর তিনদিন তাঁর পূজা করেন পৃথিবীবাসী। এভাবেই ভাণ্ডানি পূজার প্রচলন হয়। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, মাথাভাঙ্গাতে দশমীর পর থেকে পর পর তিনদিন আজও ভাণ্ডানি পূজা হয়ে আসছে।

উত্তরবঙ্গের লোকপুরাণে নদীর উৎপত্তির সাথেও নারী ভাবনা মিলেমিশে এক হয়েছে। তিস্তা নদীর উৎপত্তি নিয়ে যে লোককথা এই অঞ্চলে লোকের মুখে প্রচলিত আছে তা হল- এক অসুর ছিল; সে শিবপূজা করত। কিন্তু শিব পূজা করলেও সে কখনও শিবের স্ত্রী পার্বতীর পূজা করেনা। এই ঘটনায় পার্বতীর খুব রাগ হয় এবং পার্বতী সেই অসুরের সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন সেই অসুরের খুব জল তেষ্টা পায়। সে মহাদেবের কাছে গিয়ে জল চায়। মহাদেব তখন পার্বতীর বুক থেকে নদীর সৃষ্টি করেন এবং সেই নদী থেকে অসুর জল পান করে তার তেষ্টা মেটায়। সেই নদীই আজকের দিনে তিস্তা নদী নামে পরিচিত।

আরেকটা ঘটনার উল্লেখ উত্তরবঙ্গের লোককথায় পাওয়া যায়- আলাইকুড়ি বা আলাইকুমারী নামে এক রাজকন্যা জনৈক এক রাজার প্রেমপ্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে, কাছের এক নদীতে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে তাঁর নাম থেকেই সেই নদীর নাম হয় আলাইকুমারী।

শুধু নদী ভাবনা কিংবা ভান্ডানি, কালী বা মনসা পূজা নয়, মা দুর্গা এই অঞ্চলে নানা বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছেন। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে পূজাটি, সেটা হল- কোচবিহারের দেবীবাড়ি পাড়ায় কোচ-রাজবংশের ইষ্টদেবী বড়দেবীর পূজা। এই পূজা ঘিরে নানান ঘটনা প্রচলিত আছে লোকের মুখে মুখে। তারই মধ্যে একটি হল— সালটা ছিল আনুমানিক ১৫৬২। কোচবিহারের তখনকার মহারাজা নরনারায়ণ এবং তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ (যিনি চিলারায় নামে পরিচিত) যখন আসাম রাজ্য জয় করতে যাচ্ছিলেন, তখন পথে পড়ে সংকোষ নদী। সেই সংকোষ নদীর তীরে রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ সৈন্য সমেত ঘটা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে ব্রাহ্মণ মতে, রাজবংশের ইষ্টদেবী ভগবতীর পূজা করেন। তখনই সেখানে দেবী আবির্ভাব হন এবং রাজাকে আদেশ দেন ব্রাহ্মণ মতের পাশাপাশি রাজা যেন দেবীকে ব্রাহ্মণ নন এমন কোনও মানুষ দিয়ে অব্রাহ্মণ মতেও পূজা দেন। রাজা সেই আদেশ পালন করেন। তারপর দেশে ফিরে রাজা নরনারায়ণ ভগবতী-কে যে রূপে সংকোষ নদীর তীরে দেখেছিলেন, সেই আদলেই মূর্তি তৈরি করে পূজা চালু করেন। এই পূজা বড়দেবী পূজা নামে পরিচিত। এখানে মূর্তির রঙ গাঢ় লাল, বড় বড় চোখ; মূর্তিটি দশভুজা; হাতের ত্রিশূল অসুরের বুকে বেঁধানো। এই অসুরের গায়ের রঙ গাঢ় সবুজ। বড়দেবী মূর্তির দুপাশে ওনার চার সন্তান লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী নেই। তাঁর বদলে মূর্তির দুপাশে রয়েছে জয়া এবং বিজয়া। এই দুর্গার বাহন বাঘ এবং সিংহ উভয়ই। তারা দুদিক থেকে অসুরের দু'হাত কামড়ে ধরেছে। বড়দেবীর মূর্তির উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট মতো। আগে দেবীবাড়ি পাড়ায় বড়দেবীর এই মন্দিরটা ছিল না। পরবর্তীতে ১৯১৫-১৯১৬ সালের দিকে দেবীবাড়ি এলাকায় পাকা মন্দির বানিয়ে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ন সেই মন্দিরের ভেতর বড়দেবীর পূজা করেন। মন্দির তৈরির আগে খড় দিয়ে ঘর বানিয়ে দেবী পূজা হতো। বড়দেবীর পূজার রীতিনীতি প্রচলিত দুর্গাপূজা থেকে একেবারেই আলাদা। এই দেবীর পূজা একইসঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ মতে করা হয়।

কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের মা ভবানী এবং কাত্যায়নি দেবীর সাথে এই বড়দেবীর অনেক গঠনগত মিল পাওয়া যায়। মা ভবানীর মূর্তিটাকে বলা চলে বড়দেবী মূর্তির ছোট আকার। আর এই কাত্যায়নি দেবীর মূর্তিতে দেখা যায় দেবীর ত্রিশুল অসুরের বুকে বেঁধানো; অসুরের দুই হাত দু দিক থেকে কামড়ে ধরেছে দেবীর বাহন বাঘ এবং সিংহ উভয়ই। এই

কাত্যায়নি দেবীর পূজা কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার দিন হয়। ওনার পূজার হওয়ার পর, তারপর মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করা হয়। কাত্যায়নি দেবী মূর্তি কোন রাজা স্থাপন করেন সে ব্যাপারে কিছু জানা যায় না।

আরেকটা পূজার কথা উল্লেখ করতেই হবে, সেটা হল- কাঠামিয়া দুর্গাপূজা। ১৮৮৯ সালে কোচবিহারের বৈরাগী দীঘির উল্টো দিকে সাত বিঘা তেরো কাঠা জমির ওপর মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ তৈরি করলেন মদনমোহন মন্দির। মন্দির তৈরির বেশ কিছু বছর পর, মদনমোহন মন্দিরের পাশেই একই জমিতে আরেকটি মন্দির তৈরি করে দুর্গা পূজা শুরু হয়। এই দুর্গা কিন্তু আমাদের চেনা পরিচিত দুর্গা মূর্তির মতই দেখতে। দুর্গার দুপাশে গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী রয়েছে। অর্থাৎ মা ভবানী বা বড়দেবীর সাথে এই দুর্গা ঠাকুরের একেবারেই মিল নেই। কোচবিহারে রাজার আমল থেকে প্রচলিত দুর্গাপূজার মধ্যে এই দুটো দুর্গা পূজা হল অন্যতম পুরনো পূজা। মদনমোহন মন্দিরে এই দুর্গা পূজাই 'কাঠামিয়া দুর্গা' নামে পরিচিত। এইরকম নামের কারণ হল, কোচবিহারে ওই আমলে প্রথম এই দুর্গাপূজাই ছিল যেটা এক চালায় বা এক কাঠামোয় পূজা হতো। এই কাঠামিয়া দুর্গা পূজার সাথে প্রচলিত দুর্গা পূজার অনেক মিল রয়েছে, তবু কিছু কিছু জায়গায় পূজাপদ্ধতির তফাত চোখে পড়ে।

অষ্টমীর শেষ আর নবমীর শুরু এই মাঝের সময়ে 'সন্ধি পূজা' হয়। নবমীতে পূজা এবং ভোগ বিতরণের সাথে সাথে একটি বিশেষ প্রথা দেখা যায়। সেটা হল, ওই দিন কুমারী মেয়ে এবং ব্রাহ্মণদের মদনমোহন মন্দিরে দুপুরে ভোজন করানো হয়। ভোজনের শেষে কুমারী মেয়েদের কাপড় দান করা হয় এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করা হয়। দশমীতে সকালে ঘট বিসর্জন হয় এবং বিকেলে প্রতিমা বিসর্জন হয়। এই দশমীর দিন কাঠামিয়া মন্দিরের এক পাশে বড়দেবীর পূজার ঘট, এবং মদনমোহন মন্দিরের সমস্ত দেব দেবীর পূজার ঘট, এমনকি কাঠামিয়া দুর্গা মায়ের পূজার ঘট-ও একসঙ্গে এনে জড়ো করে একরকম পূজা করা হয়। এই পূজা 'অপরাজিতা পূজা' নামে পরিচিত।

একটি অঞ্চলে কত রকমের লোকায়ত দেবীর পূজা হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত উত্তরের এই বাংলা। ঘন জঙ্গল, যোগাযোগের অভাব সম্ভবত এর অন্যতম মূল কারণ— একই দেবীপূজার ভিন্ন নামকরণ হয়েছে ভিন্ন এলাকায়। তবে একটি প্রশ্নে সর্বত্র যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা হল— দেবীকে স্রেফ মন্দিরের গর্ভগৃহে বা ঘটে প্রতিষ্ঠা করে তার থেকে দূরে থাকতে চায় নি স্থানীয় গ্রামীণ মানুষেরা, বরং দৈনন্দিন জীবনের নানা গল্পগাঁথার সঙ্গে জড়িয়ে দেবীকে ঘরের মেয়ে আখ্যা দিয়েই পূজা করতে দেখা যায় এখানে। উত্তরের আদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বরাবরই নারীকে অধিক কর্মঠ স্বনির্ভর হিসেবে এগিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে পুরুষের চাইতে, দেবীর নানানরূপে পূজা নারী বন্দনারই নামান্তর, যে ধারা আজও একইরকম প্রবাহমান।

তথ্যসূত্রঃ-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ— ডঃ গিরিজাশংকর রায় । উত্তরবঙ্গের পূজাব্রত ও উৎসব— রণজিৎ দেব। ইতিকথায় কোচবিহার- ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল। উত্তরের লোকায়ত জীবন (১-ম খণ্ড)- পর্বনন্দ দাস। এখন ডুয়ার্স পত্রিকা (অক্টোবর, ২০১৫)। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি- ডঃ দিলীপকুমার দে। লোকসংস্কৃতির অঙ্গন- সম্পাদক- নারায়ণ চন্দ্র বসুনীয়া।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ- স্বর্গীয় অমীয় বক্সী, মাননীয় হিমাদ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য ও দেবব্রত চাকী।

মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী

বসন্তের পূজা পরব ব্রত প্রজনন ও সন্তানের সুস্থ জীবন কামনায়

শীতের ধার কমে এলে ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হন রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে, তাঁর অঙ্গে জড়ান পলাশের কুমকুম, শিমূলের রঙ বাহার। কোকিলের কুহুতানে মন উদাস। এত যুদ্ধ রক্তপাত, এত লয়ের পরেও প্রকৃতির এমন মোহন সাজ! এ ভূমিতে আরও কিছুকাল শ্বাস নেওয়ার মায়াময় ইচ্ছে জাগে যে! এভাবেই প্রকৃতি নীরবে শান্তির বাণী প্রচার করেন বুঝি! ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুলের সঙ্গ দিচ্ছে হরেক বুনোফুলের মিঠে ঘ্রাণ। গুণগুণ মৌমাছির ব্যস্ততা ফুলে ফুলে, মুকুলে মুকুলে। ঘিঞ্জি শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে বসে এ রূপের দর্শন পাওয়া ভার, সেখানে রবীন্দ্র গান আর কেবল টিভি ভরসা।

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে / দেখিস নে কি শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে"। কবির চোখেও বসন্তের এই শূন্য করার নিঃস্ব করার কঠিন রূপ ধরা পড়ে বইকি। খাল বিল নদীনালা শূন্যপ্রায়! কাদায় মুখ গুঁজে বৃষ্টির অপেক্ষায় জলের ফসল। মাছে ভাতে বাঙালির থালায় নিষেধাজ্ঞা। জিওল মাছের গায়ে পোকা হয় এসময়, সুতরাং কোনওক্রমেই মুখে তোলা উচিত নয় সিঙ্গি-মাগুর-কৈ। শুকনো বাতাসে উড়ে বেড়ায় হাজার রোগের জীবাণু, অতএব ইমিউনিটি বাড়াও। ভাতের পাতে তেতো— উচ্ছে, নিমপাতাভাজা, করলাসেদ্ধ, তেতো ডাল। বাঙালির হেঁশেলে আছে নানা ওষধি, খেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোল। ওই বসন্ত যেন ছুঁতে না পায় 'কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি'। উত্তরের নানা প্রান্তে শীতলা পুজোর আয়োজন

আজও ধুমধাম করে হয় বসন্তের এই রোগকে প্রতিরোধ করবার আশায়।

হিন্দু বাঙালির বারোমাসে তের পার্বণ, ফাল্গুনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ বাংলায় মেয়েদের পালনীয় ব্রত কিছু কম নেই। ফাল্গুনে শিবরাত্রির ব্রত পালিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। অল্পেই তুষ্ট হন শিব তাই তিনি আশুতোষ। সকল দেবতার দেবতা তাই তিনি মহাদেব। তিনিই একাধারে রুদ্র ও শিব অর্থাৎ ভয়ানক ও মঙ্গলময়। সৃষ্টির রক্ষক হিসাবে তাঁর প্রতীক লিঙ্গ যা প্রজননের চিহ্ন। তিনি মহাযোগী ও সন্ন্যাসী। কঠোর তপস্যায় ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি লাভ করেছেন বিপুল জ্ঞান ও অযুত ক্ষমতা। কৈলাস তাঁর আবাসভূমি। সমুদ্র মন্থনের কালে ভয়ংকর বিষ উঠে আসে, ব্রহ্মার অনুরোধে জগতের রক্ষাহেতু মহাদেব সে বিষ নিজকণ্ঠে ধারণ করে হলেন নীলকণ্ঠ। সংগীতের রাগরাগিনীর স্রষ্টা, নৃত্যকলার উদ্ভাবক তাই তিনি নটরাজ। এত প্রকারের গুণ কি কোনও মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব! এই মহাযোগী মহাদেবকে পতি হিসেবে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন দক্ষ কন্যা সতী; সে অন্য কাহিনী। কিন্তু এমনতর পতির আকাঙ্ক্ষায় থাকেন মেয়েরা? শিব চতুর্দশী পালিত হয় এযুগেও ? উত্তর কিন্তু হ্যাঁ। ভারতবর্ষ জুড়েই আছে মহাদেবের মন্দির। অতি প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে ছুটে যান ভারতের নানা জায়গায়।

বাংলার ঘরে ঘরে শিব চতুর্দশী ব্রত পালনের উৎসাহ আজকের 'বিবাহ ডট কম' যুগে উধাও হয়ে গেছে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। দেখুন গিয়ে শিব চতুর্দশীতে গ্রামে শহরে মন্দিরে মন্দিরে উপবাসী কন্যাদের বিশাল লাইন। শম্বুক গতিতে মহাধৈর্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পূজাস্থলের দিকে কন্যেরা। হাতে তাদের পূজার উপকরণ। শিবের মতো বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ ব্রত পালনে, এখনও এমনতর বিশ্বাস কাজ করে নিশ্চয়ই মনের গভীরে। এ দেবতার পুজোর উপকরণও সামান্যই। গঙ্গামাটি, ফুল ,ফল, বেলপাতা, দুধ, ঘি আর মধু। নিতান্ত শিশু থেকে বয়স্ক, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নানান বয়সী নারীরা রয়েছেন একই সারিতে। শিবের কৃপালাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভক্তরা জল ও অন্যান্য উপকরণ ঢালবেন শিবলিঙ্গে। এ ব্রতের নিয়ম হল শিবরাত্রির আগেরদিন নিরামিষ খেয়ে থাকতে হয়, সংযমী হয়ে রাত কাটাতে হবে। শিবরাত্রির দিন উপবাসী থেকে গঙ্গামাটি দিয়ে চারটি শিব গড়ে রাত্রের চার প্রহরে এক একটি করে শিবের পুজো করতে হয়। প্রথম প্রহরে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে

পূর্ববর্তী সময়ে কেবল সংসার ও সন্তানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে নারী জীবন। যুগের পর যুগ ধরে বহির্জগতে কোনও ভূমিকা তেমন ছিল না নারীর। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গেই জড়িত ছিল তার অস্তিত্ব। অপরদিকে বসন্ত, কলেরা, ওলাওঠা ইত্যাদি রোগে উজাড় হয়ে যেত গাঁয়ের পর গাঁ। উৎকণ্ঠিত মাতৃহৃদয় উপবাসে থেকে নানা ব্রত পালনের মধ্যে দিয়েই সংসারের বৈভব আর সন্তানের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করে নিশ্চিন্ত হতে চাইত হয়ত বা।

পুজো করতে হয়, দ্বিতীয় প্রহরে দই দিয়ে, তৃতীয় প্রহরে ঘি দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে পুজো করতে হয়। সারারাত জেগে, পরদিন ব্রতকথা শুনে প্রণাম করে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাকে দক্ষিণা দান দিয়ে এরপর নিজে ভোজন করা যাবে। নারী পুরুষ সবাই এ ব্রত পালন করতে পারেন। এ ব্রতের ফল কী? বলা হয় সমস্ত ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত হচ্ছে শিব চতুর্দশী ব্রত। এ ব্রত নিষ্ঠা নিয়ে পালন করলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারপ্রকার ফল লাভ হয়।

ফাল্গুনের আরেক ব্রত গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রত। এ ব্রতপূজায় জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি ধুয়ে যায়। এরপর আছে চৈত্র মাসে পালিত কিছু ব্রত পার্বণ।

চৈত্রলক্ষী ব্রত বা তিলফুল ব্রত। সারাদিন উপবাসী থেকে এ ব্রত করতে হয়। উপকরণ বলতে পিটুলির আলপনা, ফুল, চন্দন, দুর্বা, নৈবেদ্য জল। এ ব্রত করলে সংসারে কোনও অভাব থাকে না।

অশোক ষষ্ঠী ব্রত। ব্রত শেষে ছয়টি মুগ-কলাই ও অশোক কুঁড়ি দই দিয়ে মেখে খেতে হবে। এইদিন ভাত খাওয়া নিষেধ। ফলমূল খাওয়া যায় ব্রত শেষ করার পর। এই ব্রত পালনে পুত্রকন্যারা দীর্ঘজীবি হয়।

নীলষষ্ঠী ব্রত। চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় শিবের মাথায় ডাবের জল ঢেলে শিবকে প্রণাম করে, জলপান করার নিয়ম। ব্রতের উপকরণ বলতে বেলপাতা, ডাব, বেল, শসা, আতপ চাল ও অন্যান্য ফল। এই ব্রত পালনের ফলে সন্তানবতী নারীদের সন্তানেরা নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচে।

রামনবমী ব্রত। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে। রামের আবির্ভাবের দিন তাই এদিনটির নাম রামনবমী। রামনবমী ব্রত পালন করেন অনেক ভক্তজন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করতে পারে, এতে কৃতী সন্তান লাভ হয় এবং সেই সূত্রে জীবনে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়।

পূর্ববর্তী সময়ে কেবল সংসার ও সন্তানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে নারী জীবন। যুগের পর যুগ ধরে বহির্জগতে কোনও ভূমিকা তেমন ছিল না নারীর। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গেই জড়িত ছিল তার অস্তিত্ব। অপরদিকে বসন্ত, কলেরা, ওলাওঠা ইত্যাদি রোগে উজাড় হয়ে যেত গাঁয়ের পর গাঁ। উৎকণ্ঠিত মাতৃহৃদয় উপবাসে থেকে নানা ব্রত পালনের মধ্যে দিয়েই সংসারের বৈভব আর সন্তানের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করে নিশ্চিন্ত হতে চাইত হয়ত বা।

বাংলার লোকায়ত কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে আরও কিছু পূজা বা উৎসব পালিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি বা বছরের শেষ মাসটির অন্তিম লগ্নে। যেমন গাজন, চড়ক ও নীলপূজা। সবই শিব বা মহাদেবকে উদ্দেশ্য করেই উদযাপিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে আজকের যুগেও। গাজন সন্ন্যাসীরা নানা দেবতার সাজে সজ্জিত হয়ে মাগন করে আনে ঢাক বাজিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে। তারপর পুজোপাঠ শেষে সবাই একসঙ্গে প্রসাদ নেওয়া। কোনও মন্দিরে বা বাড়িতে নয়, চড়ক উৎসব হয় কোনও মাঠে। চড়ক গাছকে পুজো করে সেটিকে মাটিতে পুঁতে ওপরে বাঁশ লাগানো হয় সে বাঁশের সঙ্গে একজন বা দুজন ভক্তের পিঠে লোহার হুক ফুঁড়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে বৃত্তাকারে ঘোরানো হয়। কঠিন এই সব ক্রিয়া কীভাবে সম্ভব হয় সে এক আশ্চর্য বিষয়! শরীরে, জিভে, গালে অনেক ভক্ত লোহার শিক ফুঁড়ে নেয়। গাজন সন্ন্যাসীদের সেখানে বিশেষ সম্মানের চোখেই দেখা হয়। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের মানুষ মূলত বৃষ্টি ও আগামীতে প্রচুর ফলনের আকাঙ্ক্ষায় পুজো করেন। ধর্মঠাকুর তথা শিবের কাছে তাঁদের এই প্রার্থনা। শিব তিনি তো প্রজননেরও দেবতা। ভক্তের মনস্কামনা পূরণে সদা তৎপর।

বসন্তে শেষ হয়ে আসে ঋতু পরিক্রমার শেষলগ্ন। বর্ষ বিদায়ের ক্ষণ এসে হাজির হয় পৃথিবীর দরজায়। এবার যাত্রা শুরু আগামীর পথে, তবে শেকড় বিস্মৃত হই না বলেই এই সব ব্রত-পার্বণ পূজা-পাঠ। যুগান্তরের রীতি নিয়মের প্রাচীন পাঠ হৃদয়ে নিয়েই নতুন বছরের নতুন উড়ানের আকাঙ্খায় শুরু হয় পরিক্রমার নতুন পর্ব।

তনুশ্রী পাল

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্ত্বা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

গার্গী

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক নারী

উপনিষদ শুধুমাত্র কোনও দর্শন নয়, এ এক জীবনবোধও বটে। সঠিকভাবে উপনিষদ পড়লে বোঝা যাবে রেনেসাঁসের বহু আগে আরও এক নবজাগরণ ঘটেছিল ভারতের মাটিতে, তারই ফল এই উপনিষদ। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেসব উপনিষদগুলো রচনা করা হয়েছিল সেখানে তাদের রচয়িতার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য,উদ্দালক, বচক্নু সহ যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী এবং বিদুষী নারী গার্গীর নাম পাওয়া যায়। উপনিষদের অনেকগুলো ভাগের মধ্যে একটি হল বৃহদারণ্যক উপনিষদ। সেখানেই আমরা খুঁজে পাই তিন নারীর নাম, গার্গী, কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ী। বলতে দ্বিধা নেই এই তিন রমনীর জীবন, বোধ, চিন্তাধারা, জ্ঞান সব কিছুতে আলো ফেললে খুব সহজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। সেই কোন প্রাচীন যুগে দাঁড়িয়ে এই তিন নারী আজকের যে কোনও আধুনিকাকে পেছনে ফেলে দিতে পারে তাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা আর জ্যোতির ছটায়। এমন নারীদের কথা জানতে পারাও ভাগ্যের। আজ পাঠককে শুধু গার্গীর কথাই জানাব।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ভারতেরই মাটিতে এক রাজার সভাগৃহে বসেছিল বিরাট এক প্রশ্ন উত্তরের আসর। সেই আসরের মধ্যমণি ছিলেন ঋষি বচক্নু আর সৈরিন্ধ্রী সন্তান গার্গী বাচক্নবী। নিজের বাচন ভঙ্গি ও প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি পরাজিত করেছেন তাবড় বড় বড় সমস্ত মুনি ঋষিদের। হেরেও তাঁরা হয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। কোনো ঈর্ষা বা হীনমন্যতা গ্রাস করেনি তাদের। অথচ গার্গীর জ্ঞান ছিল আক্ষরিক অর্থেই ঈর্ষণীয়।

যুগটা এমনই ছিল যেসময় মেয়েদের শিক্ষা নৈব নৈব চ! কন্যা সন্তানের বাবা মায়েরাও চাইতেন না মেয়েরা শিক্ষিত হোক। কিন্তু বচক্নু গার্গীর ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলেন এ সাধারণ মেয়ে নয়, তাঁর সন্তান একটি অমূল্য রত্ন। তাই স্ত্রী সৈরিন্ধ্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও তিনি মেয়েকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিজের শিষ্যদের পাশে বসিয়ে শোনাতেন পাঠ। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন গার্গী। সেযুগের আর পাঁচটা মেয়ের মতো ছিলেন না একেবারেই। এত বড় অনুভবী ও পর্যবেক্ষক মনের মেয়ে শুধু সে যুগে কেন এযুগেও বিরল। গার্গীর প্রিয় বিষয় ছিল ব্রহ্মবিদ্যা। ওইটুকু বয়সেই তাঁর এই বিষয়ে আগ্রহ ও প্রশ্ন অবাক করত অনেক জ্ঞানীগুণীকেই।

গার্গীর ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে চর্চার কাহিনী জনপ্রিয়। গল্পটি খানিকটা এইরকম, বিদেহরাজ জনক নাকি একবার তাঁর রাজসভায় ঘোষনা করেছিলেন উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সবচাইতে ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি পাবেন বিপুল দক্ষিণা। কিন্তু কার সবচেয়ে বেশি ব্রহ্মজ্ঞান? কে পাবেন রাজার এই দক্ষিণা? কারও কাছে এর উত্তর নেই। এইসময় সকলকে চমকে দিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলে উঠলেন, তিনিই এর যোগ্য দাবিদার। সবাই অবাক, উত্তেজিতও। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন পরম জ্ঞানী এক ঋষি যার চেহারা, কথা বলার ভঙ্গি, ভাষা সব কিছুই ছিল আকর্ষনীয়।

অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষান্বিত হলেন, তর্ক যুদ্ধের আহ্বান করলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে। একে একে প্রশ্ন তীরের মতো ছুটে আসতে লাগল ঋষির দিকে। কিন্তু সব প্রশ্নেরই জবাব তিনি হাসি মুখে দিয়ে যেতে লাগলেন এতটুকু উত্তেজিত ও অধৈর্য না হয়ে। ধীরে ধীরে হার স্বীকার করে নিলেন সকল ঋষিরা, যদিও সেইসব ঋষিরা নিজেরাও ছিলেন পরম জ্ঞানী।

এইসময় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করার জন্য উঠলেন আরেক পরম ব্রহ্মজ্ঞানী, একটাই পার্থক্য তিনি নারী। সকলে অবাক, যদিও সেই নারীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ ছিল না কারও। এতক্ষণ এই প্রশ্নোত্তর চলাকালীন গার্গী মুগ্ধ হচ্ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান দেখে, সহনশীলতা দেখে। ভেতরে ভেতরে তিনিও তৈরি করেছিলেন নিজেকে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর। অবশেষে সে সুযোগ মিলল। প্রশ্ন করলেন তিনি, উত্তর দিচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক্য। সে এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত।

অবশেষে গার্গী করলেন সেই অমোঘ প্রশ্ন, 'ব্রহ্মলোক কীসে ওতপ্রোত?' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পেরিয়ে কোন লোক আছে? যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রথম হোঁচট খেলেন। পেলেন লজ্জা, এতটুকু মেয়ের কাছে তিনি হেরে যেতে নারাজ। তাই তিনি বেশি প্রশ্ন করতে না বললেন গার্গীকে, সাবধান করলেন, কোনও নারী যদি বেশি প্রশ্ন করে তবে খসে যেতে পারে তাঁর মাথা।

গার্গী নত হলেন না, উলটে যাজ্ঞবল্ক্যকে বিস্মিত করে দ্বিতীয় দফার প্রশ্নে মেতে উঠলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পাশ করলেন পরীক্ষায়। গার্গী সভার মাঝে ঘোষণা করলেন এঁর চাইতে বড় ব্রহ্মজ্ঞানী আর কেউ নাই।

সভার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে গেলেও যাজ্ঞবল্ক্য মনে মনে সেদিনই জেনে গিয়েছিলেন এই পৃথিবীতে কেউ যদি তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানে হারাতে পারে তা হল এই গার্গী। বিস্ময়ে, আনন্দে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন

অবশেষে গার্গী করলেন সেই অমোঘ প্রশ্ন, 'ব্রহ্মলোক কীসে ওতপ্রোত?' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পেরিয়ে কোন লোক আছে? যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রথম হোঁচট খেলেন। পেলেন লজ্জা, এতটুকু মেয়ের কাছে তিনি হেরে যেতে নারাজ। তাই তিনি বেশি প্রশ্ন করতে না বললেন গার্গীকে, সাবধান করলেন, কোনও নারী যদি বেশি প্রশ্ন করে তবে খসে যেতে পারে তাঁর মাথা।

তিনি। হেরেও যে এত সুখ তা কি এখন এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করতে পারব?

গার্গী সম্পর্কে তেমন আর কিছু বিশেষ জানা যায় না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, অর্থাৎ যজ্ঞে অংশ নিতেন, অন্যান্যদের সঙ্গে তর্কে মাততেন। আজীবন ব্রহ্মচারিনী নির্ভীক এই নারীর সে যুগে জন্ম যেন যুগটাকেই চিহ্নিত করে। গার্গীর চরিত্র, জীবন যাপন পর্যালোচনা করলে তেমন কোনো দুর্বল দিক খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই। কী জানি কোনোদিন এই তেজস্বী ঋষির প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েছিল কিনা তাঁর মন? আজকের নারী হয়ে খুব জানতে ইচ্ছে করে।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এইরকম মহীয়সী নারীর আমাদের জীবনে বড়ই প্রয়োজন। কারণ একমাত্র এমন নারীই পারে জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি আর প্রজ্ঞা দিয়ে সুন্দর এক স্বপ্ন গড়তে।

শাঁওলি দে

ভদ্রলোক

শাশ্বতী চন্দ

তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গেল অয়নের। সন্তর্পণে বিছানা ছাড়তে গিয়ে দেখল কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে আছে রিমি। ঘুমায়নি যে সেটা অয়ন হলফ করে বলতে পারে। নয় মাসের পুরানো বৌয়ের ঘুমের ধরণ আর রাগের ভঙ্গীর মধ্যে ফারাক করতে পারবে না এমন অবোধ তো অয়ন নয়।

ইচ্ছে হল একবার আলতো করে ছুঁয়ে দেয় রিমিকে। একটু আদর, একটু সোহাগেও কি আর রাগ ভাঙবে না রিমির? কিন্তু কেন যেন ইচ্ছেটা জোরদার হল না। হয়ত ভয় পেল। মাঝ রাতে চেঁচামেচিতে পাশের ফ্ল্যাটের লোকেদের ঘুম ভাঙুক সেটা তো বাঞ্ছনীয় নয়। বা কাল সন্ধে থেকে পাক খাওয়া নিজের ক্রোধের উষ্মাই বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাকে টেনে নিল।

ডায়েনিং টেবিল হাল্ডুলপাল্ডুল হয়ে আছে। কাত হয়ে পড়ে আছে চিনেমাটির ফুলদানি। ছেতরে গিয়েছে দুটো গোলাপ। একটা গোলাপ আবার সাঁতার কাটছে ডালের বাটিতে। এঁটো থালায় স্তূপীকৃত ভাত, তরকারি, মাছ। স্যালাডের টমেটো, শসা, পেঁয়াজ গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। এক টুকরো আলু পায়ের তলায় পড়ে চিপটে গেল। পিছলে পড়তে পড়তে চেয়ার ধরে নিজেকে সামলাল অয়ন। বিশ্রী টকো এঁটো গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বমির উদ্রেক হল অয়নের। দ্রুত জলের বোতল তুলে লাগোয়া চিলতে ব্যালকনিতে গেল।

জলের বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল। তেষ্টার প্রাথমিক প্রয়োজন মেটা মাত্র পেটে জানান দিতে লাগল খিদে। স্বাভাবিক। সেই কোন দুপুরে ব্যাঙ্কেই লাঞ্চ সেরেছিল। তারপর থেকে বার কয়েক কফি। আশিসের সঙ্গে ডিনারে বসেছিল ঠিকই তবে কতটুকু পেটে গিয়েছে সে তো নিজেই জানে। কিছু কি আছে ঘরে খাওয়ার মত? রিমির রান্না নয়, এমন কিছু? আরে হ্যাঁ, আশিস তো ঢাউস এক মিষ্টির বাক্স হাতে করে এনেছিল। গোলমালে খোলাই তো হয়নি। কোথায় আছে ওটা? ফ্রীজে তুলেছে রিমি? মনে হয় না। সব যেভাবে এলোমেলো করে রেখে এসে শুয়ে পড়েছে রিমির মত গোছানো মেয়ে তাতে মনে হয় না ঠান্ডা মাথায় ফ্রিজে মিষ্টির প্যাকেট তুলেছে।

রান্নাঘরে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেল প্যাকেটটা। প্যাকেটসুদ্ধ তুলে এনে ব্যালকনিতে চেয়ারে আরাম করে বসল অয়ন। প্যাকেট খুলে টপাটপ মুখে চালান করল দুটো কালাকাঁদ। আরে ক্ষীরের পুলিও আছে তো। তুলতে তুলতে আড় চোখে তাকাল বেডরুমে। শোয়ার ভঙ্গিমা বদল করলে রিমি। কাঁদছে না তো? কান পাতল। কোনও হালকা ফোঁপানি ভেসে আসছে না তো? কেমন একটা অপরাধবোধ এল। বিছানার কাছে এসে রিমির পা ধরে আলতো নাড়া দিল, "ওঠো। মিষ্টি খাবে?"

উত্তর দিল না রিমি। শুধু সোজা হয়ে বসল। তারপর নেমে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ড্রেসিংটেবিলের স্টুলে বসে একটা ক্ষীরের পুলি মুখে তুলতেই যাবে ফিরে এল রিমি। হাতে প্লেট। চামচ। প্লেটে হাতে বানানো কেক এক টুকরো। অয়নের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে তার থেকে গোটা চারেক মিষ্টি নিয়ে প্লেটে রাখল। তারপর এগিয়ে দিল অয়নের দিকে। ধরা গলায় বলল, "ঠিক করে খাও।"

কেকের দিকে ভীত চোখে তাকিয়েছিল অয়ন। দৃষ্টির ভাষা বোধহয় পড়তে পারল রিমি। বলল, "আমার বানানো নয়। দোতলার ফ্ল্যাটের সেনকাকিমা দিয়ে গিয়েছেন। ওদের জামাইয়ের জন্মদিন ছিল, তাই।"

একটু বুঝি লজ্জা পেল অয়ন। খুব বেশি রূঢ় হয়েছিল কি আজ রিমির ওপর? খুব বেশি আহত করা হয়ে গিয়েছে? এমনিতে রিমি তো ভীষণ ভাল মেয়ে। মিষ্টি চেহারা। চেহারার মানানসই মিষ্টি স্বভাবও। শান্ত। ভদ্র। বাইরের টান নেই। বায়নাক্কা

নেই। অয়নের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। ভালবাসে অয়নকে। যত্ন করে খুব। এমন বৌ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। শুধু একটাই দোষ, যদি তাকে আদৌ দোষ বলা যায়। মাত্রা জ্ঞানের অভাব। সামান্য কমনসেন্সের অভাব।

ছোটবেলায় মা বাবাকে হারিয়েছে রিমি। মানুষ হয়েছে ঠাকুরমা ঠাকুরদার কাছে। এমনিতে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি প্র্যাক্টিকাল হয়, ম্যাচুয়ার্ড হয়। তবে ঠাকুরমা ঠাকুরদার মাত্রাতিরিক্ত আদরেই কি এমন ছেলেমানুষ রয়ে গেল রিমি? অন্যমনস্ক হয়ে যায় অয়ন।

অয়ন একইসঙ্গে ভোজনপ্রিয় আর পেটরোগা। বাইরের খাবার সয় না পেটে। আবার জিভও চায় রকমারি স্বাদ। এমন অবস্থায় ছেলেরা নিজেরাই খুন্তি ধরতে শিখে যায়। কিন্তু অয়ন শেখেনি। সু-রাঁধুনি মায়ের রান্নাঘরে তার রসনাপূর্তির অঢেল আয়োজন ছিল। ডাল, ভাত, পোস্ত, মাছের ঝাল, ঝোল,অম্বল থেকে মোগলাই, চাইনিজ। আতান্তরে পড়ল চাকরি করতে এসে। প্রথম পোস্টিং কেই বা কবে হোম টাউনে পেয়েছে। প্রথম পোস্টিং বোলপুরে। দুঃসহ গরম, আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন থেকে দূরত্বযাপনের কষ্ট। তবে সে সব কষ্ট ছাপিয়ে গিয়েছিল খাওয়ার কষ্ট। রান্নার মাসি, হোটেল, হোম ডেলিভারি, ব্যাঙ্কের ক্যানটিনের ট্যালট্যালে ঘুঘনি আর আধ ভাজা পরোটা। একটা পেটে সয় না তো আরেকটায় জিভ বিদ্রোহ করে। তখনই ঠারে ঠারে বাড়িতে বিয়ের কথা তুলছিল।

বছর দুয়েক পর চাকরি পাকা হল। ট্রান্সফার হল শিলিগুড়িতে। তখন অয়নের বাড়ি থেকেই বিয়ের কথা উঠল। অয়ন সাফ বলে দিয়েছিল, "মেয়ে দেখার সময় একটা জিনিষ শুধু খেয়াল রেখো। মেয়ে দেখতে শুনতে যেমনই হোক, অন্য গুণ থাকুক আর না থাকুক, এমনকি পড়াশোনা তেমন না জানলেও চলবে। কিন্তু রান্নাবান্না যেন জানে। এটা মাস্ট।"

এ কথায় সব তুতো বোনেরা কলকল করে উঠেছিল, "সে কি রে ছোড়দাভাই। বৌ কি শুধু রান্না করার যন্ত্র নাকি? এমন পুরানোপন্থী নাকি তুই? নারীবাদীরা জানতে পারলে তোকে তুলো ধুনে ছেড়ে দেবে। বুঝলি?"

অয়ন গলা উঁচু করে বলেছিল, "যা, যা। ভারি সব নারীবাদী এসেছে। এই যে তোরা সব নাচছিস, গাইছিস, পিড়িং পিড়িং করে লাফাচ্ছিস, সংসার করতে গেলে এগুলো কোনও কম্মে লাগবে না। তার চেয়ে রান্নাবান্না শিখে রাখতি তো তোদের বরগুলো একটু খেয়ে বাঁচত। ইশ, তোদের যারা বিয়ে করবে তাদের যে কী দুর্দশা ভেবেই খারাপ লাগছে।"

"আর আমাদের খারাপ লাগছে সেই মেয়েটার কথা ভেবে যে তোকে বিয়ে করবে। তুই তো ঘুরতে নিয়ে যাবি না বেচারিকে, হোটেলে খাওয়াবি না, শপিং করাবি না। শুধু সকাল থেকে সন্ধে রান্নাঘরেই আটকে রাখবি।"

আরেকজন বলেছিল, "আর তোদের প্রেমালাপ কেমন হবে জানিস? আগুন তাঁতে পুড়ে যাওয়া মুখে কপালের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে তোর পাশে বসবে। তারপর মশলা বেটে বেটে ক্ষয়ে যাওয়া আঙুল দিয়ে তোর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলবে, হ্যাঁ গা,কাল একটু সিঙ্গি মাছ এনো তো। কাঁচকলা দিয়ে ঝোল রেধে দেব তোমায়।"

বলার ভঙ্গীতে হাসিই পেয়েছিল অয়নের। তবু ছদ্ম রাগে বলেছিল, "প্রেম কি শুধু চাঁদ, তারা, ফুলেই থাকে? ভাতের হাড়িতে থাকে না? চিংড়িমাছের মালাইকারিতে থাকে না? চিকেন রেজালাতে থাকে না? এই বুঝি বুদ্ধির দৌড় তোদের? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। জানিস? তা জানবিই বা কেমন করে? বইপত্রের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে তোদের? হত শাহরুখ খানের ডায়ালগ, ঠিক মনে থাকত।"

হেসে গড়িয়ে পড়েছিল তুতো বোনেরা, "তোর বৌ বুঝি জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে রান্না করবে? চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, বলতে বলতে এক থাবা নুন দিয়ে দেবে ঝোলে। আর মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য বলতে বলতে কালোজিরা? ওই কবিতা মাখা রান্না খেতে পারবি তো ছোড়দাভাই?"

বোনেদের ওই ভবিষ্যৎ বাণী কি অভিশাপের মতই গায়ে বিঁধল? নাহলে অনেক বন্ধুই তো বিয়ে করেছে অয়নের। এমন সমস্যা আর কারও কি হয়েছে?

রান্নার মাসি, হোটেল, হোম ডেলিভারি, ব্যাঙ্কের ক্যানটিনের ট্যালট্যালে ঘুঘনি আর আধ ভাজা পরোটা। একটা পেটে সয় না তো আরেকটায় জিভ বিদ্রোহ করে। তখনই বাড়িতে বিয়ের কথা তুলছিল। অয়ন সাফ বলে দিয়েছিল, "মেয়ে দেখার সময় একটা জিনিষ শুধু খেয়াল রেখো। মেয়ে দেখতে শুনতে যেমনই হোক, অন্য গুণ থাকুক আর না থাকুক, এমনকি পড়াশোনা তেমন না জানলেও চলবে। কিন্তু রান্নাবান্না যেন জানে। এটা মাস্ট।"

মা অবশ্য এসে হাল ধরেছিলেন, "কী যে বলিস তুই বাবুয়া আগডম বাগডম। যত্ত সব মান্ধাতা আমলের ভাবনা চিন্তা। আরে আজকালকার কোন মেয়েটা বিয়ের আগে রান্নাঘরে ঢোকে? তাই বলে কি তারা বিয়ের পর রান্না শিখে নেয় না? নাকি রান্না করে বর আর দশজনকে খাওয়ায় না? শিক্ষিত একটা মেয়ের এসব শিখতে কি সময় লাগে? আর তাছাড়া রান্নার দরকারে বিয়ে তো তোর ঠাকুর্দার বাবার আমলে হত? আমি বাপু আমার এমন হ্যান্ডসাম, শিক্ষিত, ভাল চাকুরে ছেলের জন্য ফুটফুটে বৌমাই চাই। ভাল ঘরের শিক্ষিত মেয়ে। সে রান্না জানুক আর নাই জানুক। দরকার হলে আমি ট্রেনিং দিয়ে দেব।"

কয়েকবার মেয়ে দেখার আসরে যেতে হয়েছে অয়নকে। খুব ইচ্ছে করত পাত্রীকে রান্না জানে নাকি জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু বিচ্ছু বোন দু একটা সঙ্গে সঙ্গেই থাকত বলে ইচ্ছা দমন করত। কায়দা করে অবশ্য জিজ্ঞেস করত, হবি কী আপনার? হতাশ হয়েছে উত্তর শুনে প্রতিবার। কেউ বলেছে, সিনেমা দেখা। কেউ বলেছে, ঘুরতে যাওয়া। গান করা। পেন্টিং পর্যন্ত বলেছে একজন। কিন্তু রান্না বলেনি কেউ। একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে সবাইকে নাকচ করে দিয়েছে।

তবে বুঝতে পারছিল, এভাবে বেশিদিন চলবে না। পাত্রী দেখার আসরে সামিল হওয়া একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তাছাড়া বাড়ির লোকেরাও বিরক্ত হচ্ছে। রিমির ক্ষেত্রে বাড়ির লোক প্রাথমিক পছন্দটা সেরেই অয়নকে ডেকেছিল। তাই অয়নও মরীয়া হয়ে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নয়, সোজা ব্যাট চালিয়েছিল, "রান্না পারেন? শখ আছে?"

লম্বা মাথা নেড়েছিল রিমি, "হ্যাঁ। খুব। কত রান্না মুখস্থ আমার।"

খুশি হয়েছিল অয়ন। তবে একটু খটকা যে লাগেনি তা নয়। রান্নার আবার মুখস্থ কী? একি বীজগণিতের ফর্মুলা? না জীবজন্তুর বিজ্ঞানসম্মত নাম? তবে আর খুঁতখুঁত করার সময় পায়নি। বিয়ের বাজনা বেজে উঠেছিল। তারপর দু মাস তো গোলাপি ডানায় ভর করে উড়ে গেল। লক্ষ লক্ষ দম্পতির যেমন হয়। বিয়ে, দ্বিরাগমন, হানিমুন, এর বাড়ি নেমন্তন্ন, ওর বাড়ি ঘুরতে যাওয়া। মাঝে মাস খানেক রিমি থেকে গেল অয়নের মায়ের কাছে, মালদার বাড়িতে। তারপর যে দিন সত্যিকারের সংসার শুরু হল, সেদিনই বিস্ফোরণটা হল।

অয়নের আবদার ছিল ফ্রায়েড রাইস আর মাটন কষার। "পারো তো?" এই প্রশ্নের উত্তরে লম্বা করে ঘাড় নেড়েছিল রিমি, "কী যে বলো! একদম মুখস্থ। শুধু এই জিনিষগুলো এনে দাও।" বলেই লম্বা এক ফর্দ ধরিয়েছিল অয়নের হাতে।

বাজার যেতে যেতে একটু যে অস্বস্তি হয়নি অয়নের, তা নয়। মুখস্থ? না না। করতে অভ্যস্ত বলতে বোধহয় মুখস্থ বলে ফেলেছে। উত্তেজনায় গুলিয়ে ফেলেছে। হতেই পারে উত্তেজনা। বরকে প্রথমবার রেঁধে খাওয়াবে।

খুশি ছিল অয়ন। স্নান সেরে ড্রয়িংরুমের ডিভানে আরাম করে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ছিল। একটু পর পর নানাবিধ সুগন্ধ ভেসে এসে উতলা করে দিচ্ছিল ঘ্রানেন্দ্রিয়। "খেতে এসো," ডাকটা স্বর্গের অপ্সরাদের সঙ্গীতের মত ঠেকেছিল।

স্বর্গ হইতে পতন হতেও সময় লাগল না বেশি। সাদা ধবধবে প্লেটে সবুজ কমলার ছিটে দেওয়া একতাল সাদা পিন্ড দেখে চমকে উঠেছিল, "এটা কী?"

রিমি বলেছিল, "ফ্রায়েড রাইস। একটু গলে গিয়েছে। আমার কী দোষ! নেট থেকে রেসিপি নিয়েছিলাম। বলেছিল সেদ্ধ করতে। কিন্তু কতক্ষণ তা বলেনি। তাই গাজর, ক্যাপসিকাম সুদ্ধ গলে গেল। কিন্তু মটরশুটিগুলো আস্ত আছে। দ্যাখো দ্যাখো।"

আর দেখা! এই পিন্ড গলা দিয়ে নামবে না বুঝে অয়ন দৌড়েছিল পাউরুটি আনতে। অন্তত পাউরুটি দিয়ে মাটন কষাটা তো খাওয়া যাবে। সেটা তো আর গলে যায়নি।

তা গলে যায়নি। বড্ড প্রাণকাড়া রঙ হয়ছিল মাটন কষার। টকটকে লাল। মুখে দিয়েই বুঝতে পারল প্রাণ কাড়াই বটে। দু হাতা এ খেলে আর দেখতে হবে না। প্রাণ পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ান দেবেই। তীব্র ঝালে জ্বলে গিয়েছিল ব্রহ্মতালু ইস্তক। কুকুরের মত জিভ বের করে হা হা করতে করতে কোনওমতে বলেছিল, "কতটা লঙ্কাগুড়ো দিয়েছ?"

নিষ্পাপ মুখে বলেছিল রিমি,"রেসিপিতে তো লেখা ছিল। এক চামচ।"

"কোন চামচ দিয়ে দিয়েছে দেখি।"

একটা রাইস স্পুন এনে দেখিয়েছিল রিমি, "এটা। তবে ভাবলাম ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে একটু বেশি ঝাল হলে ভালো লাগবে। তাই হাফ চামচ বেশি দিয়েছি।"

শুনেই যেন আগুনের গনগনে আঁচ আরও বেশি করে জিভে অনুভব করেছিল অয়ন। কিন্তু রিমি তার ভুল নিয়ে নির্বিকার ছিল, "রেসিপিতে যদি স্পষ্ট করে না বলা থাকে তাহলে আমি কী করব? আমার কোনও দোষ নেই।"

অয়নের মনে হয়েছিল চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে,"রেসিপি রেসিপি, তোমার কান্ডজ্ঞান নাই কুসুম?"

এ রকম কান্ড আরো দু চার বার হওয়ার পরেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, বৌয়ের সোনা হাতের রান্না সোনা মুখ করে খাওয়ার ভাগ্য তার নেই। সবার তো সব ভাগ্য হয় না, দীর্ঘশ্বাস সহকারে মনকে বুঝিয়ে আবার রান্নার লোকের ব্যবস্থাতেই ফিরতে চেয়েছিল।

কিন্তু চাইলেই কি আর পারা যায় সব? ওই যে, রান্নাই আমার হবি, বলেছিল রিমি। আর সেই কথাকে প্রমাণ করতে রান্নার মাসিকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে রেঁধে ফেলত স্পেশাল দু চার পদ। সেই সব পদের সব আলাদা আলাদা গল্প।

দোষ অবশ্য অয়নেরও আছে। কোনওদিন সত্য কথাটা সহজ গলায় বলতে পারেনি। ভেবেছে, বলা যায়? যায়? বৌ আগ্রহ করে খাবার সাজিয়ে ততধিক আগ্রহ গলায় নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন হয়েছে গো, তার মুখের আলো নিভিয়ে দিয়ে কি বলা যায়, জঘন্য হয়েছে। রান্নাটা তোমার আসে না।

ফল হয়েছে মারাত্মক। অয়নের, ভালোই তো, বেশ তো, মন্তব্যকে সাংঘাতিক প্রশংসা মনে করে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে রিমির। আগে ছিল বই ম্যাগাজিনের বা নেটপ্রাপ্ত রেসিপি। এবার নব উদ্যমে রেসেপি উদ্ভাবনে নেমে পড়েছে। আর সেসব কী উদ্ভাবন কখনো বেগুনের পেট কুরে নিয়ে তাতে ডিমের গোলা ঢেলে ভেজে কালিয়া করে একাকার করছে। আবার কখনও পটলের বীজ পোস্ত দিয়ে বেটে বড়া করে দুধে ফুটিয়ে পায়েস। ধন্যি মেয়ের অধ্যবসায়। হয়ত পরিমিতিবোধ থাকলে সেগুলো উতরাতও। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। তাই বিভীষিকায় কাঁপতে কাঁপতে নামমাত্র খেয়ে উঠে পড়ে অয়ন। জঠরজ্বালা মেটাতে আবার ক্যানটিনই ভরসা।

অন্য ভাবে যে বোঝাতে চায়নি রিমিকে তা নয়। বলেছে, "আগুন তাতে গায়ের রঙ পুড়ে যায়। চোখ বসে যায়। তোমাকে ওসব করতে হবে না। তুমি বরং সাজগোজ কর, টিভি দেখো, গল্পের বই পড়ো। সময় কাটানোর জন্য রান্না করার কোনও দরকার নেই। গান শিখবে? গিটার?"

অভিমানী গলায় বলেছিল রিমি, "তোমার কি আমাকে নিয়ে কোনও কমপ্লেক্স আছে? তোমার বন্ধুর বৌরা কেউ গান করে, কেউ আবৃত্তি করে, কেউ পার্লার চালায়। আমি ওসব পারি না, তাই? আরে বাবা, ওইসব হাবিজাবি গুণ সংসারে কোন কাজে লাগে বল তো? পুরুষের হৃদয়ের রাস্তা তার পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে। আমি জানি।"

"উফফফ। তুমি আমার চোখ থেকে সরাসরি হৃদয়ে ল্যান্ড করে গিয়েছ। অত লম্বা রাস্তা ধরতে যাবে কেন?"

হাসি ঠাট্টা দিয়েই কাটাবার চেষ্টা করছিল অয়ন। কিন্তু কাটে কি আর! গোলমাল হল সুপ্রিয়র বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে। সুপ্রিয় কলিগ। বন্ধু। তার বৌ অহনা দুর্দান্ত বিরিয়ানি বানিয়েছিল। মনের মত খাদ্য পেয়ে মাপের বেশিই খেয়ে ফেলেছিল। মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসাও করেছিল অহনার। সুপ্রিয়ও সমর্থন করেছিল। সুখের পরেই দুঃখ আসে, এই নিয়মে সেদিন প্রথম দাম্পত্য কলহ হয়েছিল তাদের। কলহ অবশ্য নয়। রিমি এক তরফাই গর্জে গিয়েছিল, "নিজের বাড়িতে চামচ করে খাও। আর লোকের বাড়ি গিয়ে গান্ডেপিন্ডে গেলো। যেন তোমার বৌ তোমাকে ভাল মন্দ রেঁধে খাওয়ায় না। বসে বসে বন্ধুর বৌয়ের সুখ্যাতি করলে! বন্ধু তাতে তোল্লাই দিয়ে গেল। নিজের বৌয়ের প্রশংসা করতে কি মুখে পোকা পড়ে! অভদ্র লোক একটা।"

সেদিন রিমি গর্জেছিল। অয়ন চুপ করেই ছিল। আর আজ গর্জাল অয়ন। রিমি চুপ করেই বসে থাকল। কিছুটা বিস্ময়ে। কিছুটা বা আহত হয়েও।

কোনও বন্ধু কলিগকেই বাড়িতে ডাকত না অয়ন। রিমির রান্নার এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হোক তারা, চাইত না। অনেকদিন বলেছিল রিমি সুপ্রিয়দের ডিনারে ডাকতে। নিজের রান্নার পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে যে। অয়নই এটা ওটা বলে কাটাচ্ছিল। কিন্তু আশিসকে আর এড়াতে পারল না। আশিস চেরিয়ান। কেরালিয়ান হাসিখুশি এই সহকর্মী সবিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল অয়নের। ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে হোম টাউনে। যেচে নেমন্তন্ন চাইল। এড়াবে আর কী করে? আর কোনওদিন দেখা হয় কি না হয়। তাও ভেবেছিল কোনও হোটেলে খাইয়ে দেবে। কিন্তু আশিস, বাঙালি ঘরের রান্না খাব বায়না করেই বিপদে ফেলে দিল। তাও বুদ্ধি করে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিল। রিমিকে, সারাদিন রান্না করলে গায়ের রঙ নষ্ট হয়ে যাবে এই সব ভুজুং ভাজাং দিয়ে বুঝিয়ে ভজহরি মান্নাতে ফুল কোর্স ডিনারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল।

ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার পর কলিংবেল টিপে যখন দাঁড়াতে হয়েছিল অনেকক্ষণ, দরজা খুলতে দেরি করেছিল রিমি, তখনই কেমন অশুভ সঙ্কেত পেয়েছিল অয়ন। তারপর ডায়েনিং টেবিলের ওপর সাজানো বিভিন্ন সাইজের বাটি দেখে সবেই খুশি হয়ে বলতে যাচ্ছিল, বাহ, ভজহরি মান্না তো খুব অ্যাডভান্সড, রিমি চোখ নাচিয়ে বলেছিল, "কী, কেমন? সারা দুপুর ধরে রান্না করেছি। সব নতুন রেসিপি। তোমার বন্ধু একদম চমকে যাবে।"

খাবি খেতে খেতে বলেছিল অয়ন, "কিন্তু ভজহরি মান্না?"

"ও আমি ফোন করে ক্যান্সেল করে দিয়েছি। আরে তোমার বন্ধু তোমার বাড়ি এসে হোটেলের খাবার খাবে, তাতে কি তোমার মান থাকবে? বলো? আমার গায়ের রঙ বেশি দামি না তোমার সম্মান?"

একবার ভেবেছিল অয়ন বেরিয়ে গিয়ে বিরিয়ানি কিনে এনে ম্যানেজ দেবে। কিন্তু সময় পায়নি। তার আগেই আশিস এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। রাতেই ট্রেন। একটু আগেভাগেই চলে এসেছিল। ফিরে গিয়ে কিছু গোছগাছ আছে তাই।

হাল ছেড়ে দিয়ে মজাই দেখছিল অয়ন টেবিলে বসে। যে আশিস, "এটা কী ভাবি? চালকুমড়ার কোপ্তা? হাউ সুইট" বলে হাসিমুখে কোপ্তা মুখে তুলেছিল সেই আশিসই বিব্রত মুখে শুধু জল খেতে শুরু করল। তারপর সার বেঁধে আসতে লাগল, ডিমের পোস্তকারি,আলুর দো-পেয়াজা, মাসরুম বাটা দিয়ে মাংস। আশিসের দুরবস্থা যথেষ্টই বুঝতে পারছিল অয়ন। নিজে ভুক্তভোগী কিনা। রিমির সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেও পারছে না। আবার গিলতেও পারছে না। অবশেষে অয়নই মুক্তি দিল তাকে, "তোমার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো।"

"হা হা ঠিক ঠিক সেনভাই।" বলে আশিস তরমুজের পায়েস আর সবেদার হালুয়ার ডেসার্টের প্রলোভন এড়িয়ে উঠে যায়।

আশিসকে এগিয়ে দিয়ে ঘরে ঢোকার পর দেখেছিল রিমি গোমড়া মুখে বসে আছে। অয়নকে দেখেই অনুযোগের ঝাঁপি খুলেছিল, "তুমি যেমন অভদ্র তোমার বন্ধুগুলোও তেমন অভদ্র। চব্য চোষ্য রান্না করে খাওয়ালাম, একটা শুকনো প্রশংসা পর্যন্ত করল না। আর কোনওদিন তোমার কোনও বন্ধুকে যদি রান্না করে খাওয়াই।"

এতগুলো দিনের সঞ্চিত ক্রোধ ফণা তুলেছিল, "তোমার অশেষ করুণা হবে তাহলে। আমাকেও দয়া করে তোমার ঐ অখাদ্য এক্সপেরিমেন্টগুলো গিলতে বলো না। তুমি বলছ আমি অভদ্র? তবে শোনো, আমি সত্যিকারের ভদ্রলোক। তার প্রমাণ, তুমি রান্না করতে পারো না। পারো না না বলে বলা ভালো, জঘন্য রান্না করো। কোনো সুস্থ মানুষ ওই ছাইপাশ খেতে পারে না। আমি খেয়েছি। শুধু তোমার কাছে ভদ্রতা রক্ষা করব বলে। বৌয়ের কাছেও ভদ্রতার নীতি লংঘন করে না তাকে অভদ্র বলা? হু?"

বলেই ঢকঢক করে জল খেয়েছিল অয়ন বোতল থেকে। গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল বাটি দু চারটে। তাকিয়েও দেখেনি। যেমন দেখেনি রিমির ম্লান হয়ে আসা মুখ।

সকালের রোদ খাটের পায়া ছুঁয়েছে। এত ঘুমিয়েছে নাকি অয়ন? ঘোর ভাঙা চোখে আগের রাতটা মনে করার চেষ্টা করল। রিমি কোথায়? ওদিকটা তো নিভাঁজ পরিস্কার। ব্যালকনিতে আছে? বাথরুমে? রান্নাঘরে?

রিমি যে কোথাও নেই, না ঘরে না বাইরে, সেটা বুঝতে একটু সময় লেগে গেল অয়নের। সঙ্গে সঙ্গে বরফগলা জল যেন নেমে গেল মেরুদন্ড বেয়ে। নেই? চলে গিয়েছে? কোথায়? ফোন করল। মোবাইল সুইচড অফ বলছে। দৌড়ে গিয়ে আলমারি খুলল। এত জামা কাপড়। কিছু নিয়েছে কি নেয়নি কেমন করে বুঝবে? চটি? না। লাল চটিটা নেই। আরে ট্রলি ব্যাগটাও তো নেই। দাদুর বাড়ি গেল? সম্ভব। মেয়েরা রাগ হলে তো বাপের বাড়িই যায়। যাবে অয়ন। এক্ষুনি। ব্যাপারটা আর গড়ানোর আগেই হাতে পায়ে ধরে হলেও রিমির মান ভাঙাবে। আহা। কীই বা এমন দোষ ছিল! এত কঠোর কথার দরকার ছিলই না।পরে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললেই হত। ভালই তো করতে চেয়েছিল অয়নের। টনটন করে ওঠে বুকটা। এখন কোন ট্রেন আছে মালদা যাওয়ার?

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় একবার অয়ন। প্রথমে ভেবেছিল সরাসরি শ্বশুরবাড়িতেই চলে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলাল না। যদি শোনে রিমি ওখানে যায়নি। কী করবে তখন? তাই নিজের বাড়িতেই চলে এল।

ঢুকেই মায়ের সঙ্গে দেখা। অয়নকে দেখে মা উল্লসিত হয়ে বললেন, "রিমি যে বলল তবে তুই আসতে পারবি না! ছুটি পাসনি! তাই ও একা একা একা চলে এল। কী ছেলে রে বাবা। দু-ঘন্টাও বৌকে ছেড়ে থাকতে পারিস না তো সঙ্গেই এলি না কেন?"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে অয়ন। রিমি এখানেই তবে। দেখেছ কান্ড! গোসা করে

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩

উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

মেয়েরা বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে এটা তো জানা কথা। বরের ওপর রাগ করে শ্বশুরবাড়িতে এসে ঘাঁটি গাড়ে কে কবে। এ মেয়ের সবই উল্টোপাল্টা ব্যাপার।

সারাদিন রিমির পাত্তা পায়নি অয়ন। পাওয়ার চেষ্টাও করেনি। উদ্বেগ প্রশমিত হতেই বিরক্তি জেগে উঠেছে। অকারণে দৌড় করানোর জন্য। সঙ্কোচও বটে। সবাই ভাবছে বৌ ছেড়ে থাকতে পারে না বলেই বৌয়ের পিছন পিছন চলে এসেছে। কোনও মানে হয়! সত্যি কথাটা তো কাউকে বলতে পারছে না।

রাতে ভোজের আয়োজন ছিল। অনেকদিন পর অয়ন এসেছে বলে তুতো ভাইবোন সবার নেমন্তন্ন। তা জম্পেশ ভোজ হল। মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, বেগুনি, ধোঁকার ডালনা, চিংড়ি ভাপা, সর্ষে পাবদা আর বাটার চিকেন। চেটে চেটে আঙুল সাদা করে ফেলল অয়ন, "মা, ও মা, তোমার রান্নার হাত আরও খোলতাই হয়েছে। কী সব রেঁধেছ উফ। তোমার হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কত্তদিন পর এমন পেটভরে মনভরে খেলাম।"

"দূর পাগল," মা হাসেন, "আমি কিচ্ছু করিনি। সব বৌমা রেঁধেছে। আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দেয়নি।"

রিমি? এগুলো? কী করে? বিমূঢ় অয়ন।

বিচ্ছু বোনগুলো চেঁচায়, "কী রে দাদা, রান্না জানা বৌ চাই বলে তো খুব বায়না জুড়েছিলি। খুশি? কেমন বৌ জুটিয়ে দিয়েছি বল। একদিন বাইরে খাইয়ে দে আমাদের। প্রাইজ।"

"দূর। এমন রাঁধুনি ঘরে থাকতে হোটেল রেস্টুরেন্টে খায় কোন আহাম্মক। কই গো, আমাকে আরও চিকেন দাও দেখি।" অয়নের নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হতে থাকে হঠাৎ।

ঢোলা রাত পোশাক পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে মুখে ক্রিম ঘসছিল রিমি। বাঁকা চোখে অয়নকে দেখতে দেখতে বলল, "ইশ। গায়ের রঙটা একটু পুড়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে যেন। আগুনের তাত স্কিনের জন্য বড্ড খারাপ।"

পিছন থেকে রিমিকে জড়িয়ে ধরে অয়ন, "দুত্তোর গায়ের রঙ। ও সব ধুয়ে কি জল খাব? তুমি তো আজ কামাল করে দিয়েছ। এত ভাল রান্না পারো তুমি? হু?"

"আমি আরও অনেক কিছু পারি গো। গাইতে পারি। কনে সাজাতে পারি। বিএ-তে পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট পেয়েছিলাম। স্কুলে কলেজে ডিবেটে প্রাইজ বাঁধা ছিল আমার। তুমি এগুলোর খবর রাখো না। জানতেই চাওনি কোনোদিন।"

রিমির গলার অভিমানের সুর খেয়াল করে না অয়ন। নিজের ঝোঁকেই বলে যায়, "কোনওদিন জানতে দাওনি তুমি এত ভাল রান্না জান। কেন বল তো? কেন শুধু শুধু আমাকে এতদিন কষ্ট দিলে?"

"যেদিন শুনেছিলাম তুমি ভাবী বৌয়ের মধ্যে একটা গুণই খোঁজো তার রান্না করার গুণ, সেদিনই খুব রাগ হয়েছিল। এ কী রে বাবা। মেয়ে মানেই রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে শুধু। রান্না আমি ভালোই পারি। ভালোওবাসি করতে। তবে সেটাকেই সেরা কিছু মনে করি না। সেদিনই ভেবে নিয়েছিলাম বিয়েটা হলে তোমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াব একটু।"

সাদা ধবধবে প্লেটে সবুজ কমলার ছিটে দেওয়া একতাল সাদা পিন্ড দেখে চমকে উঠেছিল, "এটা কী?" রিমি বলেছিল, "ফ্রায়েড রাইস। একটু গলে গিয়েছে। আমার কী দোষ! নেট থেকে রেসিপি নিয়েছিলাম। বলেছিল সেদ্ধ করতে। কিন্তু কতক্ষণ তা বলেনি। তাই গাজর, ক্যাপসিকাম সুদ্ধ গলে গেল। কিন্তু মটরশুটিগুলো আস্ত আছে। দ্যাখো দ্যাখো।" আর দেখা।

এবার অয়ন অভিমানী হয়, "খেতে ভালোবাসি। তাই না হয় রান্না নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেই ফেলেছি। তাই বলে এমন শাস্তি দেবে? দিনের পর দিন ওইসব অখাদ্য না মানে সরি, অখাদ্য মানে, তেমন যুতসই না তো, সেটাই বলছিলাম।"

খোলা গলায় হাসে রিমি, "আরে লজ্জা পাচ্ছ কেন? অখাদ্যই তো। ওই অখাদ্য বানাতে কত যে মাথা ঘামাতে হত তা তো আর জানতে না।"

"যাক গে, যাক গে। তুমি গাইতে পারো বললে। আবার গান শিখবে নতুন করে? নাকি আবার পড়াশোনা শুরু করবে? মাস্টার্সটা করেই ফেলো না হয়। কী বলো? ঘরে তো বসেই থাকো। সকাল সকাল ভালো মন্দ রেঁধে আমাকে খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিলেই তো তোমার ছুটি। সারাদিন কর না কত পড়াশোনা করবে। কত গান গাইবে। আবার রাত ন'টা নাগাদ রান্না বসালেই তো চলবে। কী বলো?"

"আবার রান্না নিয়ে পড়লে? উফফ।"

"কাল তোমাকে প্রমাণ দিয়েছিলাম আমি ভদ্রলোক। আজ আবারও দিচ্ছি। আগেও বলেছি, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। আর সেই রসনার তৃপ্তি এনে দেয় যে কুশলতা সেই কুশলতাই শ্রেষ্ঠ। ভদ্রলোকের এক কথা। সুতরাং আমি ভদ্রলোক। প্রমাণিত?"

রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে রিমি। আকাশপথে যেতে যেতে ফিক করে হেসে দেয় আধখানা চাঁদও। তারপর ঝলমলে জ্যোৎস্না ঝরাতে থাকে। ঝরাতেই থাকে।

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং

চতুর্থ পর্ব

দার্জিলিং শহরের বাইরে একটা জায়গায় যাব বলে ঠিক করা ছিল। সেটা হল 'ডেলো পাহাড়'। সে পাহাড়ের কুয়াশা মাখা চেহারা দেখতে বেশ লাগে। তবে দার্জিলিং টু কালিম্পং তিন চার ঘন্টার মামলা। ডেলো পৌঁছোতে আরও খানিকটা। হিসেব করে দেখলাম, খুব জোর ঘন্টা দেড়-দুই ডেলো পাহাড়ের মাথায় সেই চমৎকার পার্কে কাটান যাবে। তাই সই!

বসন অবশ্য ডেলো যাওয়ার কথা শুনে ঝটপট পয়েন্ট হিসেব করে ফেলল। ডেলো কাছাকাছি কী কী দেখার আছে। তা ছাড়া যাওয়ার সময় বুদ্ধদেবের মন্দির, বাতাসিয়া লুপ তো অবশ্য দ্রষ্টব্য। তদুপরি পথে পড়বে লামাহাটা আর লাভার্স ভিউ পয়েন্ট।

ওকে বোঝালাম, এত দেখলে সব গুলিয়ে যাবে। সে না হয় লামাহাটায় থেমে চা খাব আর তিস্তা-রঙ্গিতের সঙ্গম দেখতে দেখতে আনারস মাখা চাখব। তবে বুদ্ধমন্দিরটা একটু উঁচুতে। সেখান থেকে দার্জিলিং শহরের টুকরো ছবি দেখতে মন্দ লাগবে না। অতএব সক্কাল সক্কাল রোদ্দুর ঝলমল দার্জিলিং টাউন পেরিয়ে

সীমানা গ্রাম

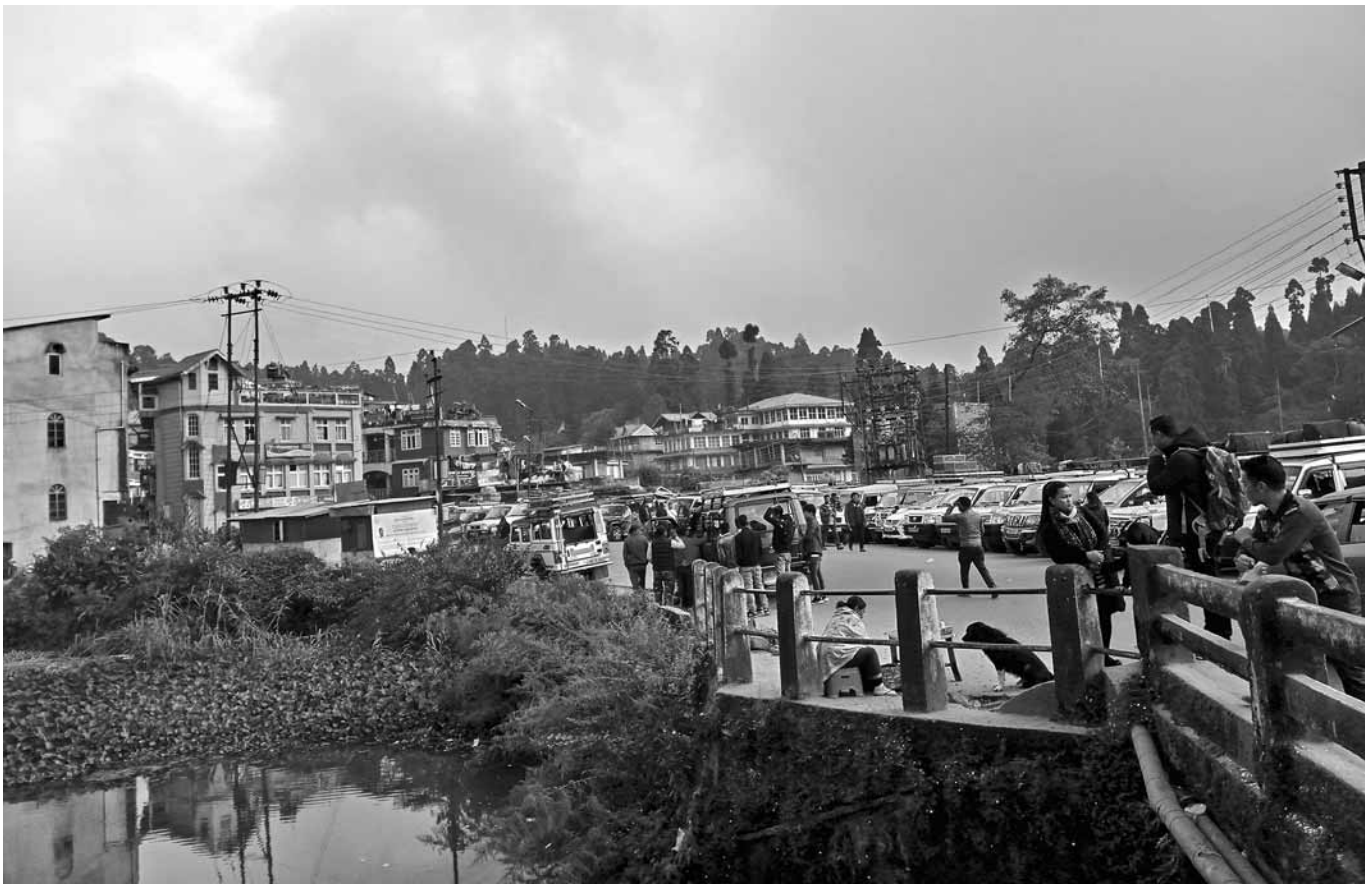

যাওয়ার পথে রেল লাইনের ধারে বুদ্ধমন্দিরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখলাম। ধর্মচর্চার ব্যাপার বৌদ্ধরা বেশ ক্যাজুয়াল। বাড়াবাড়ি নেই। মন্দিরের ভেতরে বৌদ্ধের ছবি চলছে আর দরজার বাইরে বারান্দায় একটা জুতো নিয়ে ফুটবল খেলছে গোটা ছয়েক সন্ন্যাসী।

সাধেই কি পাহাড়িরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে!

মন্দির প্রাঙ্গন থেকে দার্জিলিং-এর চমৎকার ভিউ দেখলাম। বৌ মন্দিরের পুজো দেখা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতেই সন্ন্যাসীরা খেলা থামিয়ে প্রবল উৎসাহে ভেতরে পাঠিয়ে দিল তাঁকে। আধঘন্টা হাওয়া হয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ পর বসন গাড়ি থামিয়ে বলল, বাতাসিয়া লুপ।

বাতাসিয়া যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। ওই লুপের বারোটা বেজে গেছে। অনেক কিছু স্থাপন করা হয়েছে লুপের জমিতে। সে সব দেখতে হয়ত ভালই লাগে, কিন্তু যে জন্য বাতাসিয়া লুপ, সেটা এখন উন্নয়নের চাদরে আচ্ছাদিত। বসনের খাতিরে টিকিট কেটে সেখানে একটু ঘোরাঘুরি করলাম।

বেরিয়ে আসতেই বসন বলল, টয় ট্রেনের জয় রাইডের মজা আগের মত কেন নেই সেটা বাতাসিয়ায় ঢুকলেই বোঝা যায়। আমি বললাম, ঠিক। অপরাধ নেবেন না, ঘুম টু দার্জিলিং টয় ট্রেন চাপা একটা 'লস আইটেম'। ওই ট্রেন এনজেপি কি শিলিগুড়ি জংশন থেকে না ছাড়লে মজা নেই। রেল লাইনের ধারে এখন অনেক বাড়ি।

বলতে দ্বিধা নেই লামাহাটার পার্ক একটা চমৎকার জিনিস। পাহাড়ে ঢালে অমন একটা পার্কে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। আমরা অবশ্য পার্কটাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখলাম। চা সিগারেট খাওয়া হল। পর্যটকের ভিড় মন্দ নয়। কিন্তু এখানে দশ মিনিট অতিরিক্ত গেল রেস্টোরান্টের ক্যাশ কাউন্টারে থাকা ব্যক্তিটির কারণে। একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জন বিল দিতে

দু' নম্বর চা নেওয়ার পর গপ্পো জমে গেল। জানলাম, প্রশাসন খুব কড়া এখন। পথঘাট নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আর, হবে না-ই বা কেন? গুরুং-এর মাস্তানগুলো হয় জেলে নয় ফেরার। শুনতে শুনতে আমি আরেকবার চোখ দুটো প্যান করলাম ম্যাল জুড়ে। না। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কোথাও টাঙান নেই। কয়েকজন কিশোরকে দেখলাম রোলার স্কেট পায়ে এঁটে দক্ষিণের ঢাল গড়গড়িয়ে ছুটছে। ঘোড়ায় চড়ে পাক খেয়ে এলো দুটো বাচ্চা। তারপর কালো ঘোড়ায় এক মহিলা।

আসায় তিনি সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন। ক্যালকুলেটরের বোতাম টিপতে গিয়ে হাত কাঁপিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আর দু-কাপ কফির বিল হিসেব করলেন ছশো পঁচিশ টাকা। চোখের সামনে দেখলাম একজনের ডিম ভাজার অঙ্ক আঙুলের অতিরিক্ত চাপে হয়ে গেল তিন হাজার।

বেগতিক দেখে একটি চটপটে ছোকরা ছুটে এসে সমস্যার সমাধান করল।

তারপর আবার যাচ্ছি। লপচু বাগানের চা খেতে চিরকালই ভাল লেগেছে। সে বাগান পেরিয়ে ক্রমে ক্রমে লাভার্স ভিউ পয়েন্ট। আনারস মাখা খাব বলে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। দোকানি কী জানি আনতে গেল। সামনেই হরেক ফল ঝুলছে। তার মধ্যে গোল গোল সবজেটে ফলগুলো (নাম ভুলে গেছি) মধুমেহ রোগির পক্ষে ভালো বলেই জানি। হঠাৎ কয়েকজন সাহেব নারী-পুরুষ এসে সেই ফলগুলোর দিকে তর্জনি নির্দেশ করে বিচিত্র সুরে বলল, 'হোটিস ডিস?'

দোকানি নেই। ভাবলাম, আমাকেই জিগ্যেস করল নাকি? ভদ্রতাবশত বললাম, গুড ফর ডায়াবেটিস অ্যাজ দে সে—।

কেন জানি না সাহেবদের একজন কিচমিচ করে উঠল, হাঁ ডু উঁ নোঁ? আঁ উঁ গায়েড? লুকআল? হোঁআই ইট গুঃ ফঃ ঢা-আ-বা-টিস?'

তসলিমা নাসরিনের লেখায় পড়েছিলাম যে তিনি যখন সুইজারল্যান্ডে মৌলবাদির হুমকির কারণে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন একবার রেস্টোরেন্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা অতিথিদের কফি খাওয়াতে চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব শুনেই অতিথিরা হাঁ হাঁ করে বলে উঠেছিল, খাওয়াচ্ছেন মানে? কেন খাওয়াচ্ছেন? আমরা কি কিনে খেতে পারি না? নাকি আপনার অনেক টাকা? —ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে হল এই গোরাদের দল নির্ঘাৎ সুইজারল্যান্ড থেকে এসেছেন।

আমি ওদের পাত্তা না দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম। তাঁরা কিচমিচ করতে করতে তিস্তা রঙ্গিতের মিলন দেখতে গেলেন। যদ্দুর অব্দি গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে

আমাদের দেখতে পারছিলেন, তদ্দূর পর্যন্ত বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে কী জানি বলতে বলতে গেলেন।

একটু পরে দোকানি ফিরে এল। সে আনারস কাটার ছুরি আনতে গেছিল। খচাখচ আনারস কেটে মশলা ছড়িয়ে হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ফরেনার্স কুছ কুছ বহোৎ কোশ্চন করে দাদা! কেলেকা ব্রিড ক্যায়া হ্যায়, কেলেকে স্কিন পর ইনফেকশন হোলো নাকি— হম তো আজকল বোলেই দিই যে বহোৎ বাক্টিরিয়া ছ, ভাইরাস ভি হুন্‌ছ! ডোন্ট ইট।

জানা গেল বিদেশিরা বড়জোর কুড়ি টাকার কলা কেনে। আর কিছু খায় না। দেশি কাস্টমারই ভাল।

সেখান থেকে চলতে শুরু করে দুটো বাঁক দিয়ে বসন গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, 'ফ্রেশ ভেজটেবল দাদা। একদম কেমিকেল নাই।'

পথের কোনায় এক মহিলা ছোট্ট দোকানে মুলো, বিনস আর শাক নিয়ে বসেছে। পরদিনই ফিরব। খানিকটা করে কিনে নিলাম। বসন ঠিকই বলেছিল। সে মুলোর স্বাদ আলাদা। মুলোর যেমন হওয়া উচিত। কেনাকাটা সেরে ঘড়ি দেখে বসনকে বললাম, এরপর সোজা ডেলোয় গিয়ে থামব।

বসন এবার তাঁর দক্ষতা দেখাল। হু হু করে গাড়ি ছুটিয়ে তিস্তাবাজার পেরিয়ে, নতুন ব্রিজ টপকে, দু-একটা বাঁক দিয়ে একটা মোড়ে এসে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'ওই রোড গ্যাংটক গেল।'

তারপর নামল হিসু করতে। ফিরে এসে বলল, 'গাছ কিনবেন বললেন।'

বন্ধু নিঝুম ঠাকুর ফুলচর্চা করে। ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে কালিম্পেং নার্সারি থেকে অ্যাজেলিয়া এনে দেব। পুষ্পপ্রেমিদের কাছে নার্সারিটা অনেক বেশি উপভোগ্য। তবে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে জন্মান অতিকায় অর্কিড অবশ্যই দেখার বস্তু।

নার্সারির মূল মালি অ্যাজেলিয়ার চারা প্যাকেট করে হুড়মুড়িয়ে প্রায় নিজের ভাষায় গাছের পরিচর্যা বিষয়ে যা বোঝাল, তা আমি বোঝার চাপ নিলাম না। নিঝুম পরে সে চারাকে শ্যাম্পুর লঘু জলে স্নান করিয়ে সুস্থ করে ফুল ফুটিয়ে ফেলেছে।

কালিম্পং-এ ঢোকার মুখে ভয়ানক জ্যামজট, ধুলো আর হৈচৈ। তারপর ডেলোর দিকে, অবশেষে। পথ নির্জন হয়ে গেল। সুন্দর হতে থাকল। কুয়াশারা দেখা দিতে লাগল ইতিউতি। দূরের আকাশে চোখে পড়ল ভাসমান প্যারাগ্লাইডার। ডেলো পার্কে ঢোকার আগে ছোট্ট হোটেলে খাবার অর্ডার দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। গেটের মুখে ছোট ছোট দোকান। গ্লাইডিং-এর কাউন্টার।

ডেলো পাহাড়ের চুড়ো সত্যিই চমৎকার জায়গা। দার্জিলিং-এর ঝলমলে রোদ্দুর কালিম্পং-এ ছিল। এখানে সেটা ঘন কুয়াশার আড়ালে। নিচের দিকে তাকালে কেবল চোখে পড়বে কুয়াশার পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসা। হাওয়া একটু একটু করে গতি বাড়াচ্ছিল। ঠান্ডা বাড়ছিল একটু একটু করে। গ্লাইড করছিল কেউ কেউ। হঠাৎ হালকা রোদ্দুর উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটা মিলিয়ে গিয়ে এল দমকা হাওয়া। এইবার, এই প্রথম, দার্জিলিং-এ আসার পর কাঁপুনি ধরল। পর্যটক সেদিন গুটিকয়েক।

ফেরার সময় কাঁপতে কাঁপতে ভাত খেলাম। কাঁপুনি কমল কালিম্পং-এ এসে। সেখানে একটা মন্দিরে মিনিট কুড়ি কাটিয়ে বসনকে বললাম, সোজা দার্জিলিং।

কাল জলপাইগুড়ি থেকে সমীর তাঁর গাড়ি নিয়ে আসবে আমাদের ফেরৎ নিতে। বসনের সঙ্গে আজই শেষ দিন। টাকা পয়সা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে।

রাস্তায় খিদে পেলেও নগদ টাকা চাই। বসনকে বললাম এটিএম পেলে গাড়ি থামাতে।

কালিম্পং— সেই অর্থে ঢুকিই নি। বসন বলল, তিস্তা বাজারে টাকা মিলবে। মিলল না। বসন জানাল, তবে ঘুমের আগে কোনও চান্স নেই। ঘুমেও একদশা। টাকা মিলল দার্জিলিং-এ। তিস্তাবাজারে আসার আগেই অন্ধকার হয়ে গেছিল। ফেরার পথে বসন রকমারি ভূতের গল্প শোনাল। লামাহাটা টু দার্জিলিং নাকি চুড়েলদের আদি বাসস্থান। রাস্তায় কোনও মহিলা হাত নাড়ালে আমরা যেন না তাকাই।

দূরের অন্ধকারে পাহাড়ের গায় জোনাকির মত অজস্র আলো বাদ দিলে কেবলই অন্ধকার। চুড়েলদের পক্ষে নিঃসন্দেহে ভাল জায়গা। তবে ঘুম পর্যন্ত কেউ হাত দেখায় নি।

পরদিন সকাল এগারটার মধ্যে সমীর চলে এল। তার আগে ম্যালে একপাক ঘুরে কফি খেয়ে এসেছি। ঠিক ছিল, ফেরার সময় ঘুম থেকে ডান দিকে ঘুরে নেপাল সীমানা ছুঁয়ে মিরিক হয়ে ফিরব। দার্জিলিং যেতে হলে যদি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তবে এই পথটাই সেরা। বস্তুত, ঘুম পেরিয়ে পাঁচ মিনিট চলার পরই পথ বদলে গেল। পাইন বনের ভেতর দিয়ে, কুয়াশা মেখে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা পথ। হঠাৎ একটা জনপদ। নির্জন বিপিন। চুপচাপ দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে পুলিশ হাত দেখিয়ে অন্য পথ ধরতে বলছে।

গাড়ি বিকল্প পথ ধরল। সে এক রাস্তা বটে! খারাপ পথের আদর্শ উদাহরণ। দুলতে দুলতে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে খানিকটা সময় গেল। সমীর বিড় বিড় করে বলেই চলেছে, এটা যে কোন রাস্তা। কোথায় যে যাচ্ছি!

অবশ্য অত চিন্তার কিছু ছিল না। সব পথই এদিক থেকে মিরিক গেছে।

রাস্তা অবশেষে ভাল হল। প্রকৃতির বিশেষ বদল ঘটে নি। সমীর হাঁফ ছেড়ে গাড়ি ছোটাল। খানিকটা যেতেই একটা ছোট্ট বাজার। সামনে একটা ফলকে লেখা 'সীমানা গ্রাম'।

সমীর ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে বেশ বিস্ময় নিয়ে বলল, 'আচ্ছা! এটাই সীমানা গ্রাম।'

নেমে পড়লাম। সীমানা গ্রাম আমাদের তালিকায় ছিল না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন নামব না কেন? তদুপরি পেল্লায় সাইজের বাঁধাকপির বড়া বিক্রি হচ্ছিল। চা এর সঙ্গে এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কী মিলতে পারে এই পাইনশোভিত পথে?

অল্প জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বেশ কিছু দোকান। তার ফাঁক দিয়ে পেছন দিকে ভিউ পয়েন্ট। হু হু খাদের ওপাড়ে পাহাড়। কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে আবার প্রকট হচ্ছে। সেদিক থেকে সাউন্ড বক্সে নেপালি গান ভেসে আসছিল। ওপাড়ের পাহাড়ের খানিকটা ভারত, তারপর নেপাল। খাদ বরাবর হেঁটে যাওয়ার জন্যে খালি জমি পড়েছিল অনেকটা।

সমীর বলল, এক ঘন্টা থাকেন। টাইম আছে। আমি জিগ্যেস করে নিয়েছি। পশুপতি নগরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাব। মিরিকে খাব।

ঘন্টা দুয়েক পর সবাই প্রসন্ন চিত্তে মিরিকের দিকে রওনা দিলাম। সীমানা গ্রামের ভিউ পয়েন্টের বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে একটু যেন নেশা ধরে গেছিল। রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ ভাল লাগছিল।

দু-দিকে চা বাগানের গালিচার মধ্যে দিয়ে ধিরে ধিরে মিরিকে এলাম। মিরিক নিয়ে লেখার কিছু নেই। হোটেলের মাছের ঝোলটা দিব্যি ছিল। মিরিক আসার আধঘন্টা আগে থেকে রাস্তার পাশে অনেক বাঁদর আমাদের গুড বাই জানিয়েছিল। মিরিক এলাম মানে পাহাড় খতম। দার্জিলিং ক্রমে সমতল হয়ে শিলিগুড়ি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মিরিকে আসামাত্র জলপাইগুড়ি টানতে শুরু করেছে। কাল আবার দিওয়ালি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দার্জিলিং কি এখন শান্ত? ঝাঁকে ঝাঁকে পর্যটক আসছে। বসনরা খুশি। ম্যালের কোণায় চা বিক্রি করা তরুণী খুশি, চকবাজারের মোমো বিক্রেতা বৃদ্ধা খুশি, নেহেরু রোডের দোকানগুলো খুশি। হিলকার্ট রোড যতটা দেখেছি, প্রাণবন্ত। টাকার হাতবদল হচ্ছে।

কেবল সাংসদ আলুওয়ালিয়া বছর আড়াই হল আসছিলেন না।

(পর্ব সমাপ্ত)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

হলঙ্গারপার গিবন অভয়ারণ্য

নাগাভূমির মনজেলার কনিয়াক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ওয়াকচিঙের মায়ং গ্রামে ক'দিন কাটিয়ে ভোরবেলায় রওনা হলাম গিবন স্যাংচুয়ারির উদ্দেশে। তানহাই, তুইমুই, টিজিট, নাজিরা, আমগুড়ি হয়ে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সটান পৌঁছে গেলাম মরিয়ানির কাছে গিবন রিসর্টে। পরিচালনা, দেখভাল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাথা দিগন্ত গোগোই। দিগন্তর স্বপ্ন ভালোবাসা প্রচেষ্টা হুলক গিবনদের রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি পর্যটনের প্রসার ঘটানো। অসমিয়ার মতন বাংলা গড়গড়িয়ে বলে দিগন্ত। মন থেকে মরিয়ানির দূরত্ব সঠিক জানা নাই তবে পাহাড়, জঙ্গল, চা-বাগান, নানা জনপদ পাড়ি দিয়ে পৌঁছানোর যাত্রাপথের ধকল সইতে হয়। দিগন্ত বলে, 'দাদা একটু চা খান। তারপর চানটান সেরে দুটো সেবা করেন। আপনারা আসছেন জেনে আমি গাঁয়ের এক বঙ্গ রমনীকে নিযুক্ত করেছি। বলেছি ভাল করে মাছের ঝোলঝাল রেঁধে খাওয়াবে— আমার দাদা বৌদি আসছেন। আপনার ছাত্র অসিতদার কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি। অসিতদার সেকেন্ড হোম আমার বাড়ি।' বলেই দিগন্তর সেকি অট্টহাসি। আনন্দে থাকুন কয়েকটা দিন।

ভাই দিগন্ত সময় বাঁধা। টিকিট কাটা, থাকার উপায় নাই।

'যাই হোক ত্রুটি বিচ্যুতি হলে দাদা ক্ষমা করবেন'।

গিন্নি বলে, 'নাগা খাবার খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। এখানে এসে মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে এসেছি।'

'কী যে বলেন? নাগারাও কিন্তু অতিথিপরায়ণ। কিন্তু রান্নাবান্নায় তেমন সিদ্ধ হস্ত হয়ে ওঠেনি।'

থাক ওসব কথা। দিগন্তের কাছে শুনি গিবন রিসর্ট গড়ে তোলার ইতিহাস, পরিশ্রম, উদ্যম, নিষ্ঠা। হুলুক গিবনদের প্রথম দর্শন বছর তিরিশের বেশি বই কম হবে না। অরুণাচলের চ্যাংলাং জেলার মিয়াঁওর অদূরে নামদাফার জঙ্গলে ডেবান বাংলাতে বসে। অতঃপর রোয়িং-এ ডিবাং ভ্যালিতে। কিন্তু কেবলমাত্র গিবনদের নিয়ে অভয়ারণ্য বোধহয় এখানেই। গিবনদের নিয়ে বিশেষ করে হলংগারপার ঘিরে ইতিবৃত্ত লিখেছে সৌম্যদীপ দত্ত— অসমিয়া ভাষায়। ডিব্রুগড়ে সৌম্যদীপ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকলেও আদিবাড়ি ধুবড়িতে। উত্তর-পূর্ব ভারত তথা অসমের নানা বনভূমিতে সৌম্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বন্যপ্রাণ পরিবেশকে রক্ষা করতে। সৌম্যদের চেষ্টাতে রক্ষা পেয়েছে চক্রশিলায় গোল্ডেন লেঙ্গুর। অর্থাৎ সোনালি বানর। ওদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। সেটা শুভ লক্ষণ।

যা ঠান্ডা। মাথায় একটু জল ছিটিয়ে বসে পড়ি আহারকুঞ্জে। কত কী পদ যে রান্না হয়েছে। রুটি, ভাত, শাকপাচালী, বেগুনি, ছোট মাছের চচ্চড়ি, মাছের কালিয়া, শেষ পাতে পায়েস। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাই বল দেখি। করেছো কী ভাই দিগন্ত?

সবই আপনাদের আশীর্বাদ। সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গিন্নি আমাকে বলে, 'বেশি খেও না। লাউ-লবণ শূন্য মানুষ। বটে।

নানা গালগল্পের মধ্যে দুপুরের আহার অর্থাৎ অনবদ্য লাঞ্চ কবজি ডুবিয়ে চেটেপুটে খেলাম।

দিগন্ত বলে দাদা ডগ মিট কেমন খেয়েছেন নাগাল্যান্ডে? সুযোগ এসেছিল কিন্তু গ্রহণ করতে পারি নাই। স্টিং আংগামী এজন্য মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর লনে বসে একটু রোদ্দুর পোহাই তারপর ঘরে ঢুকে লম্বা হই।

গিন্নি বালিশে মাথা রেখে বলে— খুব ভালো খেলাম, তাই না?

হুঁ হাঁ করতে করতে চক্ষু মুদে আসে। কখন বিকেল ফুরিয়ে গোধুলির রং ছড়ায় টেরও পেলাম না।

দিগন্তর আহ্বান— দাদা চলে আসুন বাইরে চায়ের আড্ডা বসেছে। চমৎকার ব্যবস্থা। পারিবারিক থেকে হুলুক গিবন, মাজুলির মাহাত্ম্য, কাজিরাঙার গন্ডার নিয়ে আলোচনা। এতবার আসা যাওয়া আমার ভীষণ আপশোষ

মাজুলিতে যাওয়া হল না। এবারের যাত্রাতেও বাদ পড়ে গেল দিগন্ত বলে, 'কোনও ব্যাপারই নয়। নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেনে চাপুন পরদিন মরিয়ানি পৌঁছে যান। গাড়ি নিয়ে আপনাদের নিয়ে আসব।

গিন্নি চটে যায়। বয়স তো কম গেল না। এখন একটু রয়ে সয়ে ঘোরো। দিগন্ত গিন্নির বক্তব্যকে সমর্থন করাতেই আমি চুপসে গেলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত। পরপর কয়েক কাপ চা পানের সঙ্গে স্ন্যাকস। হঠাৎ দিগন্তর ডাক দাদা একবার আসুন আমার বেটাটাকে দেখে যান। আমি চমকে উঠি। গিন্নি বলে, চলো দেখে আসি। রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখি আলো-আঁধারি পরিবেশে চালের উপর বসে আছে বাদামি রঙের প্যাঁচা। বেটা বলে ডাক দিলে সুর করে আবার ডাকতে থাকে। দিনের বেলাতে দিগন্ত প্যাঁচার জন্য ফল-পাকুড় রেখে দেয়। বেটা দর্শন হচ্ছে এই সময়। ডাকাডাকির পর বেটাটা চুপ থাকে।

ঘরে বসে লাউঞ্জে রাখা পুঁথি-পুস্তক নাড়াচাড়া করি। উত্তর-পূর্ব রাজ্যের উপর বিবিধ মূল্যবান গ্রন্থ সাজানো রয়েছে। সেই সঙ্গে হস্তশিল্পের অনবদ্য সম্ভার। অসমের হরাই গামছা, বাঁশের তৈরি বহুবিধ জিনিস।

রাতে গরম রুটি সঙ্গে মুরগির ঠ্যাং, ভাজি, তরকারি, মাছ। গিন্নির মুরগিতে অপছন্দ। খাওয়া দাওয়ার পর শোবার আগে এক গ্লাস দুধ। এই অভ্যাস অনেক দিনের। বেড়াতে গেলে যেখানেই থাকি প্রথম অনুরোধ দুধের জন্য। দিগন্ত শুনে বলে, 'দাদা গরুর খাঁটি দুধ খাওয়াব আপনাকে।' সত্যি কথা বলতে কী ব্রহ্মাণ্ডে বাঙালির সুনাম ভ্রমণে ও ভোজনে। বাঙালির মত ভ্রমণ ও ভোজন বিলাসী দ্বিতীয় আর কেউ ভারতবর্ষে নেই। খাওয়া নিয়ে গবেষণা একমাত্র বাঙালিরাই জান, পারে। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ— বাঙালির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যাই হোক নৈশ আহারের পর দিগন্ত বলে, 'দাদা আগামীকাল সকালবেলা ঘুম ভাঙলে একটু চা খেয়ে আপনাদের নিয়ে যাব হুলুক গিবনদের কাছে। খুব একটা বেশি দূরে নয়। আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। না হলে আপনাদের তো সঙ্গে গাড়ি আছেই।'

তথাস্তু। এবার আলো নিভিয়ে নিদ্রা দেবীর আরাধনা।

পরদিন চায়ের ডাকে চোখ মেলি। গিন্নির ভীষণ বিরক্তি 'বেড টি'-র প্রতি। মানে ঘুমের দফারফা। চায়ের কাপ নিয়ে শিশির ভেজা উঠানে দাঁড়াই। চোখ মেলে দেখি। সবুজের মাঝে রং বাহারি পুষ্প সম্ভার। শান্ত-স্নিগ্ধ মনোরম প্রভাত। দিগন্ত রেডি হয়ে বসে আছে। দিগন্ত বলে, 'দাদা নো টেনশন। বউদিকে রেডি হতে বলেন। যত সকালে যাওয়া যায় ততই ভাল। বেশি হইহট্টগোল, চেঁচামেচি হলে গিবনরা গাছপালার আড়ালে চলে যায়। দেখতে যেমনই হোক খুবই লাজুক স্বভাবের। বাঁদর-হনুমানের মত তেড়ে আসে না।'

আমি রেডি হয়েই আছি। ঝোলাটা কাঁধে নিতে যেটুকু সময়। গিন্নিকে বললাম, 'জঙ্গলে যাচ্ছি, গো এজ ইউ লাইক বেশি তাড়াহুড়ো করো না।' দিগন্তের অসীম ধৈর্য। চোখেমুখে বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন নেই। 'চলো যাই— গিবনদের সঙ্গে মোলাকাত করে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট।' লোকালয়, চা-বাগান, রেল স্টেশন হালকা-পলকা জঙ্গল ছুঁয়ে বিট অফিসের দরজায় পৌঁছে যাই। কাছেই বন বাংলো। গাইড অনুমতি পত্র, যাবতীয় ফরমালিটিস আগেভাগেই করা ছিল। দিগন্তকে চেনে সবাই। বিট অফিসের কাছে গাড়ি রেখে পয়দলে বাঁ দিকে জঙ্গলের ভিতরে হাঁটা শুরু করি। আমাদের মত আরও কিছু মানুষজন আগুপিছুতে আছেন। তারাও গিবনের সন্ধানে এসেছেন। দিগন্তের কাছ থেকে জানতে পারলাম। ভারতে একমাত্র এখানেই দেখতে পাবেন সাত প্রজাতির বানর। এক নম্বরে হুলুক গিবন, স্লো লরিস অর্থাৎ লজ্জাবতী বানর, ক্যাপড্ লেঙ্গুর, অসমিয়া ম্যাকেক, স্টাম্প টেলড্ ম্যাকেক, রেসাস ম্যাকেক, পিগটেল, নানা প্রজাতির কাঠবিড়াল— ক্ষুদ্র থেকে অতিকায়। নানা ধরনের ধনেশের দেখা মেলে এই জঙ্গলে।

পক্ষীপ্রেমিদের স্বর্গরাজ্য হলঙ্গারপার গিবন অভয়ারণ্য। শিশিরস্নাত লতাপাতা গাছপালা সতেজ তরতাজা। সকালের সূর্যালোকের অনবদ্য বিচ্ছুরণ জঙ্গলের সরু পথে দল বেঁধে হাঁটা আর নজর রাখা এই বোধহয় গিবনের দেখা মিলবে। দিগন্ত বলে দাদা এ পথে হাতি, লেপার্ড মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। কিন্তু আমরা যে এইভাবে হেঁটে যাচ্ছি কিছু হবে টবে না তো! দিগন্ত বলে ওঠে, 'কোনও ভয় নেই। দিগন্ত আপনাদের সাথে আছে। হুলুকরা একটু আধটু দেখা দিয়েই আড়াল হয়ে যাচ্ছে। যতই আকুল হয়ে ডাকছি ওরা কিছুতেই কাছে আসতে চাইছে না।

এবারে ফিরে চলি অন্য পথে। গাইড আছে সঙ্গে। যেতে যেত কিছুটা যখন হতাশ হঠাৎ দিগন্ত বলে, চুপ, ওই উপরের দিকে তাকান। গিবন পরিবারদের আকস্মিক আগমন। প্রায় বিট অফিসের কাছাকাছি। আহা! আমাদের আনন্দ দেখে কে। এত কাছে ওদের দেখা পাব আর হাতের নাগালে, ভাবাই যায় না। আমরা বেজায় খুশি।

যেতে যেতে দিগন্ত বলে— দাদা জানেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এখানে চলে আসে গিবন, পাখি, প্রজাপতির সন্ধানে। কয়েক মাস আগে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গেছেন ইতালির এনড্রি এন্তলি, পামেলা এন্ডারসন, জাপানের টোকিও থেকে প্রায়ই আসেন মিজুকি, অস্ট্রেলিয়া থেকে আসেন প্রজাপতি প্রেমিরা। তাদের অনেকেই কীট-পতঙ্গ-সাপ-অর্কিড-মস এক কথায় ফ্লোরা ও ফনা নিয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা। ওদের আগ্রহ দেখলে পরম বিস্ময় জাগে। থাকা খাওয়া নিয়ে বিদেশি পর্যটকদের কোনও খুঁতখুঁতানি নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে

তারা আসে সেটাই তাদের কাছে ধ্যানজ্ঞান। ডা. সিজার সেনগুপ্ত প্রজাপতি নিয়ে গবেষণা করছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা করে বলেছেন তিনশো'র উপর প্রজাপতি এই জঙ্গলে দেখা যায়। রাজস্থানের কোটা থেকে প্রজাপতি পাগল প্রতিবছর এখানে আসেন শুধু প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়াতে।

হলঙ্গারপার অভয়ারণ্য পাশেই ছোট রেলস্টেশন মেলাং, অভয়ারণ্যের বিট অফিসের নামও মেলাং। ছোট রেলস্টেশন হলেও খান তিনেক প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায়। মেল ট্রেন দুর্বার গতিতে জঙ্গল কাঁপিয়ে চলে যায়। হলং গাছ আসামের জাতীয় গাছ। উত্তরবঙ্গের হলং যেমন বিখ্যাত, কিন্তু গাছ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। হলঙ্গারপার বনভূমির অতীত ইতিহাস দিগন্তের যেন মুখস্ত। ১৮৮১ সালে ব্রিটিশরা হলঙ্গার স্যাংচুয়ারি ঘোষণা করলেও গিবনদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটনের প্রসারের কথা তেমনভাবে চিন্তা করেন নাই। ১৯৯৬ সালে সৌম্যদীপ দত্তের নেতৃত্বে নেচার্স বেকন অসম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে হলঙ্গার পারকে রাষ্ট্রীয় উদ্যানে রূপান্তরিত করা যায়। ১৯৯৭-এর ৩০শে জুলাই গিবন অভয়ারণ্য রূপে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হলং নামটি যুক্ত হয়। অরণ্যের ভিতরে রয়েছে বনবাংলো। থাকার জন্য অনুমতি নিতে হবে ডিএফও, জোরহাটের কাছ থেকে। দিগন্ত থাকায় আমাদের সে সব প্রয়োজন পড়েনি। বনবাংলোর চেয়ে ঢের ভাল।

যাই হোক ঘণ্টা দুয়েকের ওপর জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসি গিবন রিসর্টে। যেতে যেতে দিগন্ত বলে বনভূমি রক্ষা করাটাই এখন চ্যালেঞ্জ। কারণ নানাবিধ। এই দেখুন জঙ্গল ফুঁড়ে রেলপথে ভয়াবহ শব্দদূষণ। হুলুকরা মাটিতে নামতে সাহস পায় না। এবং নীরব হয়ে গেলে যদিও বা নেমে আসে, অনেক সময় রেলে কাটা পড়ে। রেলের প্যান্ট্রিকার থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্যবস্তু ফেলে দেওয়া হলে বন্যপ্রাণীরা খায়। হাতিও মরে রেলে কাটা পড়ে। কিছুদিন আগে হাতির বিষ্ঠা থেকে পাওয়া গেছে প্রচুর প্লাস্টিক। বনদপ্তরের কোনও হেলদোল নেই। যেতে যেতে দিগন্ত পরিচয় করাল হলং, সাফো, শিংরি, জামুন, ডিমরু, নাহর যা কিনা গিবনদের ভীষণ প্রিয়। নদী বলতে ভোগদই। বর্তমানে ২৬টি গিবন পরিবার রয়েছে অভয়ারণ্যে।

গিবন রিসর্টে ফিরে একটু বিশ্রাম এবং প্রাতঃরাশে ফুলকো লুচি এবং আলুর দম। তারপর রোদে বসে চা পান। ধীরে সুস্থে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি। দুপুরের আহার সেরে রওনা হতে হবে ডিব্রুগড়। রাত্রি সাড়ে আটটায় রাজধানী। পরদিন দ্বিপ্রহরে নিউ জলপাইগুড়ি। একেবারে ঝটিকা সফর। মন ভরল না। যাবার মুহূর্তে দিগন্তের বিনীত নিবেদন— ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন, আবার আসবেন। আমি হেসে বললাম— আবার হবে তো দেখা... এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো।

দিগন্ত বলে, ব্ল্যাকম্যান অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ গিবনদের তরফ থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি, যখন ইচ্ছে আপনি এখানে চলে আসবেন এবং তখন সময় হাতে নিয়ে আসবেন যাতে কাজিরাঙা আর মাজুলি দর্শন করতে পারেন।

আয়তন - ২১ বর্গ কিমি। দূরত্ব - মরিয়ানি জংশন ১৩ কিমি জোড়হাট - ৩২ কিমি। যোগাযোগ - দিগন্ত গোগোই, গিবন রিসর্ট, নাগাডোরা, পোঃ নাকাছারি, জোরহাট, অসম - ৭৮৫১৩৫। মেল diganta@gmail.com চলভাষ- ৭০০২৫ ৬০০৫৩, ৯৯৫৪৪ ০৩৭৭০।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কালুর রিক্সা থেকে নির্মল-যান টোটো যাত্রা

উত্তরপক্ষ

উত্তরবঙ্গের প্রায় ছোট-বড় সব জনপদেই বিহারের মানুষদের বসবাস ছিল। নানা কায়িক শ্রমের কাজে তাদের নিযুক্ত করা হত। ধোপা, নাপিত থেকে মাংসের দোকান, রিক্সা চালক থেকে মুটে-বাস চালক অসংখ্য জীবিকায় বিহারি মানুষদের দেখা যেত। একসময় এইসব এলাকায় রিক্সাচালক বলতে বিহারিভাইদের বোঝাত। শহরের মধ্যে বা আশপাশে পতিত জমিতে ঝুপড়ি বানিয়ে দিব্যি কলোনি গড়ে তুলত তারা। খুব কম মানুষ বিহার থেকে পরিবারকে এদেশে আনত। হোলির আগের দিন সন্ধ্যা থেকে রাত অব্দি ঢোল করতালের সাথে গলা ফাটিয়ে দেহাতি গানে মনে হত বসন্ত এসেছে, সামনেই দোল উৎসব। এমন একটা সন্ধ্যায় কলেজ পড়ুয়া আমরা কয়েকজন আমাদের বিহারিবন্ধুর বাড়িতে স্বাদু ভাঙ্গের সরবত পানের কাহিনী এখনও স্মৃতিতে অমলিন। আর কালিপূজার পর হালকা শীতের ভোরে ছটপূজো সাথে ঠেকুয়া প্রসাদ এখন বাঙ্গালীরও উৎসব।

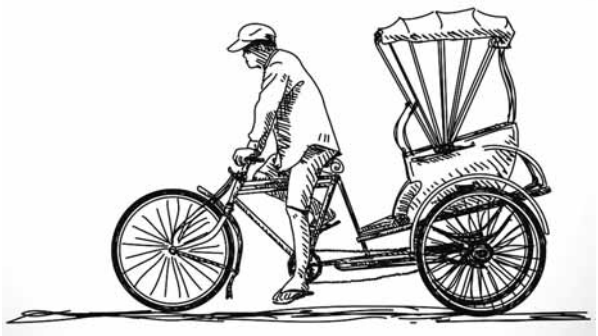

পাড়ার মোড়ে তখন দু-চারটে রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকত আর তারাও পাড়ার মানুষ হয়ে উঠত। আমাদের পাড়ার মোড়ের রঘুদা ছিল আমাদের যথার্থ অভিভাবক। বিপদে পাশে পাওয়া যেত, অসুখ হলে ডাক্তার ডেকে আনা থেকে মাসকাবারি বাজার নিয়ে আসা সবটাই রঘুদার রিক্সায়। বিগত সত্তরের দশক থেকেই লক্ষ্য করেছি স্থানীয় ভূমিপুত্ররা, মূলত ভূমিহীন কৃষি মজুরের দল, সকালের দিকে গ্রাম থেকে শহরে এসে রিক্সা চালানো শুরু করেছিল। সারাটা দিন রিক্সা চালিয়ে সন্ধ্যায় তারা বাড়ি ফিরে যেত। যে কারণে একসময় উত্তরবঙ্গের ছোট শহরগুলিতে, সন্ধ্যার পর একটু রাতে বাড়ি থেকে বেরনো প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। রাতে বাজারের পথে লোকজন খুব কম দেখা যেত। অল্প কিছু যে বিহারী রিক্সাচালক ছিল তারাই তখন ভরসা। রাতে কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে ফিরে শহর থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হত। প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে রাতে নেমে যাত্রীরা, যানবাহনের অভাবে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতো। একবার দিল্লি ফেরত ট্রেনে থেকে রাত একটায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে নেমে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পূজা সংখ্যা ম্যাগাজিন পড়ে কাটিয়েছিলাম, কারণ অত রাতে রিক্সা পাওয়ার প্রশ্নই নেই, আর যাই হোক হেঁটে ফেরার সাহস হত না।

কিছু রিক্সাচালক খুব সকাল থেকেই মর্নিং স্কুলের শিশুদের বিভিন্ন এলাকায় তুলতে এসে প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সারা পাড়ার ঘুম ভাঙ্গাত। শিশুদের ছুটি হত বেলা সাড়ে নটায়, তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারা আবার শুরু করত দিনের বেলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের একই পরিসেবা দেওয়া। সেই রিক্সাচালক বা তাদের উত্তরসুরীরা এখনও একই রকম পরিসেবা দিয়ে চলেছে। আর একটি যান এখনও চালু আছে সেটি হচ্ছে রিক্সা ভ্যান। এটিকে কেউ বলেন 'ভ্যান রিক্সা' কেউ বলেন 'রিক্সা ভ্যান'। এটি অল-পারপাস একটা প্রয়োজনীয় যান, ইট-বালি-পাথর থেকে ভারি আসবাব বহন করে, প্রতিমা বিসর্জনেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজও ভ্যান রিক্সা গ্রাম ও মফস্বল শহর জীবনে একই রকম তাৎপর্যপূর্ণ।

এখনও যে দু চার জন বিহারি রিক্সাচালক আছে তাদের কিন্তু বড্ড দেমাক, সুযোগ পেলেই বলতে ছাড়ে না— 'বিহারিরা আছে বলেই রাতের বেলাতে এখনও রিক্সার দেখা মেলে'। দিনবাজারের এমন এক বিহারি রিক্সা চালকের নাম কালু। বেঁটে চকচকে কালো রঙ। রাজনীতি থেকে বাবুদের কীর্তি সব ব্যাপারেই অল্প বিস্তর খোঁজ খবর রাখে। রিক্সা চালানর সময় যারা মোবাইল ফোনে কথা বলে তাদের ও শয়তান বলে, নিজে মোবাইল ফোন রাখবে না 'এ তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত'। কালুকে নানা সময় প্রয়োজন হয়, তখন তাকে ডাকতে আরেকজনকে ফোনে খবর দিতে হয়। আদ্যপ্রান্ত বিশ্বাসী মানুষ, অনেক ঝামেলা সামলে নিজের একটা রিক্সা হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ জীবন। যতার্থেই 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে'। দৈনিক গড়ে চারশো টাকা রোজগার। সংসার চালিয়ে সামান্য সঞ্চয় করতে হয় ওকে। কারণ দুটো, প্রথমত ভবিষ্যত, দ্বিতীয়ত প্রতি পাঁচ-ছয় বছর পর নতুন রিক্সা কিনতে হয়। যে প্রতিনিয়ত নিজেকে বিহারি রিক্সাওয়ালা বলে সে কিন্তু শহর সংলগ্ন এলাকায় অল্প একটু জমি কিনে বাড়ি করতে চায়।

একদিন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বলেছিল ‘সেই কবে যে এই টওন-এ এসেছিলাম মনে নাই। বিহারের গ্রামে আমার কোনও বন্ধু নাই, আত্মীয়রাও আমাকে চেনে না। আর এই শহরে আপনারা আছেন। আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাব না’। কথায় বিহারী টান তাই ‘টাউন’ না বলে ‘টওন’ বলে ফেলে, এ ছাড়া ওর বিহারিত্ব সবটাই ঘুচে গেছে সময়ের সাথে। এ শহরই কালুর নিজের শহর।

মনুষ্য চালিত রিক্সা ব্যাপারটায় হয়ত খানিকটা অমানবিকতাও লুকিয়ে থাকত। কলকাতায় দেখেছি দুজন পুর্ণবয়স্ক মানুষ পা গুটিয়ে সিটে বসেছে পাদানিতে একটার উপর আরেকটা টিনের তোরঙ্গ, এসব নিয়ে রিক্সা টানছে বৃদ্ধ এক রিক্সাওয়ালা। বর্ষার দিনে জলকাদা মাখা রাস্তায় কী চরম কষ্টের মধ্যে একজন রিক্সাচালক যাত্রী ও মালপত্র বহন করে তা বর্ণনা করে যায় না। ভাগ্যিস এইসব মফঃস্বল শহরে হাতে টানা রিক্সা নেই।

বিগত শতাব্দির শেষ ভাগে অটোরিক্সার ব্যাপক প্রসারণ ঘটল বড় শহরগুলো ও শহরতলীতে। উত্তরের মফঃস্বল শহরগুলোতেও অটো চালু হয়েছিল মূলত শহরতলির এলাকাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। দ্রুতযান অটো বিভিন্ন রুটে চালু হল, তবে অটোতে যাত্রীর আইনগ্রাহ্য সংখ্যা মাত্র চারজন। যদিও হামেশাই আট-দশ জন যাত্রী নিয়ে তাদের চলাফেরা করতে দেখা যেত। নির্ধারিত রুটের বাইরে যেতেও তাদের আপত্তি থাকত না যদি ভাড়া বাবদ কিছু অতিরিক্ত পাওয়া যায়। এর কিছুদিন পর চালু হল চার চাকার অটো। দশ-বার জনের যাত্রী ওতে অনায়াসে যাতায়াত করত। এই গাড়িগুলোর আচ্ছাদন ভাল এবং তুলনামূলক ভাবে দ্রুত চলাচল করে। বর্তমানে একটা তিন চাকার অটোর মূল্য প্রায় দুলক্ষ টাকা সেখানে চার চাকার অটোর মূল্য প্রায় তিনলক্ষ টাকা। যেহেতু দু-বছর পর থেকেই সারাই এর খরচ ক্রমেই বাড়তে থাকে আয় কমতে থাকে সেই কারনে ব্যাঙ্কের ঋণ সহজে পাওয়া সহজ হয় না।

গত সাত-আট বছরে লোকাল যানবাহনের সংজ্ঞা পাল্টে দিল ‘ই-রিক্সা’ যাকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় টোটো, কোথাও বা টুকটুক। উত্তরবঙ্গের শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র টোটোর দাপাদাপি। মূল্য একলাখ দশ হাজারের কাছাকাছি। গাড়িতে রিচার্জেবল ব্যাটারি আছে চারটা। ব্যাটারির ব্র্যান্ড ও মানের উপর টোটোর দাম নির্ভর করে অনেকটাই। ব্যাটারি একবার ফুল চার্জ করলে কমবেশি আশি কিলোমিটার বিনা ঝামেলায় চালানো যায়। ব্যাটারি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গড়ে আঠারো মাস পরে ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হয়। পুরনো ব্যাটারি বিক্রেতা রেখে দিয়ে নতুন চারটে ব্যাটারীর দাম ধার্য করে ষোল থেকে চব্বিশ হাজার টাকা। ই-রিক্সা বা টোটো গাড়ির উৎপাদক সংস্থাগুলো শস্তায় সরবরাহ করার লক্ষে যন্ত্রগুলোর কোয়ালিটির সঙ্গে অনায্য আপোষ করে, ব্যতিক্রমি সংস্থার উৎপাদন ব্যয় বেশি, ফলে মূল্যও বেশি। লাইসেন্স লাগে না, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন লাগে না, চালানো সহজ, জ্বালানি ভরতে হয় না। ইদানিং কিছু পুরসভা টোটো গাড়ির নিবন্ধীকরন প্রক্রিয়া চালু করেছে। এই যানের সবচেয়ে বড় গুণ এগুলো পরিবেশ বান্ধব। ধোঁয়াবিহীন এবং শব্দ নেই বললেই হয়। ছোট শহর এবং গ্রামে অল্প দূরত্বের সফর টোটোগাড়ি সহজ করে দিয়েছে।

বহু রিক্সাচালক ধারদেনা করে টোটো কিনেছেন কিন্তু ধার শোধ করার আগেই ব্যাটারি বদলের পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ায় বিপদে পড়েছেন। প্রতিদিন ব্যাটারি চার্জের খরচ চল্লিশ টাকা, ব্যাটারি পরিবর্তনের সংস্থান পঞ্চাশ টাকা, পুরনো গাড়ি সারাই-এর সংস্থান পঞ্চাশ টাকা মনে রেখে প্রায় একশত পঞ্চাশ টাকা সরিয়ে রাখতেই হয়। তাছাড়া চার বছর পর নতুন গাড়ি কেনার জন্য মাসে একহাজার পাঁচশো টাকার একটা রেকারিং ডিপোজিট খোলা উচিত। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মত ছোট শহরেও প্রতিদিন কমবেশী দশহাজার টোটো

গত সাত-আট বছরে লোকাল যানবাহনের সংজ্ঞা পাল্টে দিল ‘ই-রিক্সা’ যাকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় টোটো, কোথাও বা টুকটুক। উত্তরবঙ্গের শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র টোটোর দাপাদাপি। মূল্য একলাখ দশ হাজারের কাছাকাছি। লাইসেন্স লাগে না, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন লাগে না, চালানো সহজ, জ্বালানি ভরতে হয় না। ইদানিং কিছু পুরসভা টোটো গাড়ির নিবন্ধীকরন প্রক্রিয়া চালু করেছে। এই যানের সবচেয়ে বড় গুণ এগুলো পরিবেশ বান্ধব। ধোঁয়াবিহীন এবং শব্দ নেই বললেই হয়। ছোট শহর এবং গ্রামে অল্প দূরত্বের সফর টোটোগাড়ি সহজ করে দিয়েছে।

রাস্তায় চলে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের ধারনা এইসব ছোট শহরে যানজটের একটা বড় কারন টোটো। লক্ষ্য করবেন এদের প্রতি পুলিশ যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তবে টোটো চালকদের ট্রাফিক আইনকানুন শেখানোর জন্য অবশ্যই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিতে পারে।

আমার পরিচিত নির্মলের কথা একটু আলোচনা করো নেওয়া যাক। অভাবি মা একদিন নির্মলকে সাত বছর বয়সে এক বাড়িতে রেখে আসে, পড়াশোনা করে বড় হবে। ছেলেটি ছিল অসম্ভব দুষ্টু। প্রায়ই পাড়ার লোকজন নানা অভিযোগ করত। পাড়ার সব বাড়ির কচি আম, কচি পেয়ারা ইত্যাদি পেড়ে খেত, নষ্ট করত। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে পাশ ফেল না থাকার কারণে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠে গেল। বাড়ি থেকে স্কুলের পোশাক পড়ে জুতো মোজা পায়ে দিয়ে গটমট করে স্কুলে যায় কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেল সে ক্লাসে না গিয়ে রেল লাইনের ধারে গুলি খেলে বেড়ায় কখনও নদীতে পুকুরে সাঁতার কাটে। বাড়ির মালকিন (মাসি) শিশু নির্মলকে অসম্ভব আগলে রাখতেন। কিন্তু সে এবার ঘোষণা করল তার পড়াশোনা মোটেই ভাল লাগে না। সে আর পড়াশোনা করবেই না। তারপর প্রায় পাঁচ বছর সে শাক বিক্রি থেকে শুরু করে দোকানে ঘুরে ঘুরে মালপত্র যোগান দেওয়া ইত্যাদি নানারকম কাজ করেছে। কোথাও সে স্থির হতে পারেনি। মাসির বাড়িতে খাওয়া থাকা তখনও ফ্রি। পরে সেই বাড়ির সহায়তায় ছেলেটি ড্রাইভিং শেখে এবং ঠিক আঠারো বছর বয়সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যায়। নানা জনের কাছে কাজ করেছে, নানা রকম গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু কোথাও সে স্থির হতে পারেনি। ইতিমধ্যে তেইশ বছর বয়সে বিয়ে করে আলাদা বাড়িতে থেকে সংসার চালাতে তার হিমসিম অবস্থা।

তার বড় সহায় সেই শৈশবের মাসি। ধার-দেনা করে প্রায় একলাখ টাকা দিয়ে এবার একটা টোটো কিনে ফেলল। কিছু ঋণ ব্যাঙ্ক থেকেও নিয়েছিল। ততদিনে শহরে কয়েক হাজার টোটো ঘুরে বেড়ায়। আয়েসি মানুষ তার অত পরিশ্রম পোশায় না। পাঁচশ টাকা রোজগার করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তার কিছু বাঁধা খদ্দেরদের গাড়ি ছিল তারা বাইরে গেলেই নির্মলকে ডাকত। সেই গাড়িগুলো সে হাতছাড়া করতে চাইল না। এদিকে সন্তান এসেছে। সংসারে তখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। এবার নির্মল বাইরের গাড়ি পূর্বের মত চালান শুরু করল এবং নিজের টোটো অন্য একজনকে ২৫০ টাকা দৈনিক কিস্তিতে চালাতে দিল।

চালক খুব কম দিনই পুরো কিস্তি দিত। টোটোটিও নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছিল। প্রাইভেট ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা থেকে স্ত্রীর নামে ঋণ নিয়ে মায়ের বাড়িতে একটা ঘর তৈরি করে ফেলল। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে এখন সে বাস করে, পুত্র স্কুলে যায়। নির্মল প্রাইভেট ঋন নিয়মিত পরিশোধ করে, ব্যাঙ্কের কিস্তি বাকিও পড়ে। নানা রকম যান্ত্রিক সমস্যাও আছে। কাছ থেকে দেখে বুঝেছি ওর জীবন যাত্রার মান বেড়েছে, যদিও শুধুমাত্র টোটোর রোজগারে নয়। এটা ঠিক বর্তমান সময়ে সবাই মিলে শ্রম দিয়েই সংসার সচল রাখতে হয়, আর নির্মলের মাসি সবার ভাগ্যে জোটে না। তবে টোটো চালিয়ে সংসার চালানো লোকের সংখ্যা কম নয়। টোটো-র সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিশ্রম আরেকটি নতুন টোটোর আমদানি করেছে এরকম উদাহরণ কম নেই। শহর ও শহরতলির নিম্নবিত্ত বেকার যুবকদের একটা বিরাট অংশ আজ টোটো-র উপর নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে প্রয়োজন সরকারি নিয়মকানুন প্রবর্তন, রুট ও রেট বেঁধে দেওয়া এবং রুটিন নজরদারি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল ‘লাও তো বটে কিন্তু আনেটা কে?’ অনেকের ধারণা ভোট পার হলে সরকার বাহাদুর এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করবেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ টোটো সার্ভিস, অর্থাৎ শেয়ার, রিজার্ভ, জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রেট চালু হলে আজকের জনাকীর্ণ ব্যস্ত জীবনযাত্রায় টোটো ‘অভিশাপ’ না হয়ে ‘আশির্বাদ’ হয়ে দাঁড়াবে সন্দেহ নেই। কালু রিক্সাওয়ালারা নিঃশব্দে সময়ের সাথে বিলীন হয়ে যাবে, আগামীদিনের পথের সাথী হবে নির্মল-যান টোটো। মোবাইল অ্যাপের সংকেতে সে হাজির হবে আপনার দোরগোড়ায়, প্রবল কুয়াশা বা বর্ষায় আপনাকে ভরসা যোগাবে।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

পাঁচ বছরের সেরা দশ শ্রীমতী ডুয়ার্স

জীবনের নানা ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন ডুয়ার্সকন্যারা। গত পাঁচ বছর ধরে তাদের অনেকের কথা লিপিবদ্ধ করেছি আমরা। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে দশজনের কথা পুনর্মুদ্রণ হল, পাঠকের স্মৃতিকে আরেকবার জাগিয়ে তুলবার জন্য।

স্বপ্না বর্মণ

অলিম্পিক পদজয়ী অ্যাথলেট

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্ম নেয়, যারা নিজের প্রতিভাকে ছাপিয়ে অভাব-অনটনকে তোয়াক্কা না করে গট গট করে এগিয়ে যায়। স্বপ্না বর্মণ হল সেই রকম একটি মেয়ে। প্রতিকুল পরিবেশে, হত দরিদ্র পরিবারে জন্মেও স্বপ্না বর্মণ জায়গা করে নিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া দলে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের অন্তর্গত পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি পাড়ার নাম পাতকাটা ঘোষপাড়া। এই পাড়ার বিশিষ্ট সেন পরিবারের দেওয়া একখণ্ড জমিতে কুড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করেন পঞ্চানন বর্মণ ও তাঁর স্ত্রী বাসনা বর্মণ। এই দরিদ্র দম্পতির দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের নাম পবিত্র ও অমিত এবং দুই কন্যা চন্দনা ও স্বপ্না। পুঁথিগত শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর অনুত্তীর্ণ পঞ্চানন বর্মণ বেছে নেন রিক্সা ভ্যান চালকের পেশা। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন পঞ্চানন বর্মণ। এই কাজ করতে করতে বহু সচ্ছল ও সজ্জন মানুষের সঙ্গে ঘটে তাঁর সুসম্পর্ক। পঞ্চানন বর্মণের স্ত্রী বাসনা বর্মণ শক্তির সাধিকা, সেই কুঁড়ে ঘরেই প্রতিষ্ঠা করেছেন কালি মূর্তি। শত অভাব অনটন সত্ত্বেও করেন নিত্য কালি পুজা। বহু মানুষ সেই কুঁড়ে ঘর মন্দিরে আসেন পুজো দিতে।

স্বপ্না বর্মণের জন্ম ১৯৯৬ সালের ২৯শে অক্টোবর। ২০০১ সালে স্বপ্নাকে ভর্তি করা হয় পাতকাটা ঘোষ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালে স্বপ্না বর্মণ চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে সরকারী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাতকাটা অঞ্চল ও জলপাইগুড়ি সদর উত্তর মণ্ডলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে শক্তিগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফন বিভাগে ১ম স্থান লাভ করে স্বপ্না বর্মণ। এরপর জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লম্ফন শুধু ১ম স্থানই নয়— ১.৩৪ মিটার উচ্চ লম্ফন করে রাজ্যের মধ্যে এক নজির স্থাপন করে এই ব্যাতিক্রমি বালিকা। ক্রীড়া জগতে উত্তরণের এটাই ছিল স্বপ্না বর্মণের জীবনের 'টারনিং পয়েন্ট' এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন ঘোষপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ কর সহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ।

প্রাথমিক স্কুলের পাট চুকলে স্বপ্না বর্মণকে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর উচ্চতর বিদ্যালয়ে। ক্রীড়া বিভাগে এক কৃতি ছাত্রীকে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আপ্লুত বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষার শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার। তিনি আন্তরিক ভাবেই স্বপ্না বর্মণের কোচিং এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় সাই-এর (স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া) শাখা ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অব স্পোর্টস-এর অধীনে কোচিং নেওয়ার সুযোগ লাভ করে স্বপ্না বর্মণ, সুভাষ সরকার হলেন তার কোচ। আরএসএ-এর বিশেষ উদ্যোগে স্বপ্না বর্মণ এর দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় এবং কোচ হিসাবে নিয়োজিত হন সুকান্ত সিনহা। ২০০৭ সাল থেকে স্বপ্না বর্মণের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসাবে কাজ করে চলেছেন ব্যাংক কর্মী ক্রীড়া পাগল সমীর দাস।

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ২০১৪ তে স্বপ্না বর্মণ জীবনের সেরা উচ্চ লম্ফনের ১.৭৮ মিটার লম্ফন করে ২য় স্থান লাভ করে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত 'স্কুল এশিয়াড ২০১৩' তে স্বপ্না বর্মণ উচ্চ লম্ফনে ১ম, রিলে রেস (৪০০/৪০০) এ ১ম, জ্যাভলিন থ্রো তে ২য় এবং হ্যামার থ্রো তে ৩য় স্থান অধিকার করে ভারতীয় দলের মধ্যে সেরা হিসাবে গণ্য হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে অনুষ্ঠিত সাবগেমসে অংশগ্রহণ কালে অসুস্থ হওয়ার কারণে উচ্চ লম্ফনে ২য়, জ্যাভলিন থ্রো তে ৩য় স্থান অধিকার করে। চীনের তাইপেতে অনুষ্ঠিত এটিএফ-এ ভারতীয় দলে উত্তরবঙ্গের একমাত্র বালিকা স্বপ্না বর্মণ অংশগ্রহন করে এবং হেপটাথলন-এ ২য় স্থান অধিকার করে। স্বপ্না বর্মণ যে ক্রীড়া জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সে নিয়ে এরপর কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকে না!

স্বপ্না বর্মনের এই উত্তরণে তার বাপ-মায়ের অনুপ্রেরণা অপরিসীম। বাসনা বর্মণ তাঁর কুঁড়েঘরে প্রতিষ্ঠাতা কালি মাতাকে পুজো দিয়ে কামনা করেন, তাঁর কন্যা যেন ক্রীড়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'বাসনা' ও 'কামনা' সমার্থক। কালি মাতা বাসনা বর্মণের কামনা পূর্ণ করেছেন, তাই স্বপ্না বর্মণের মেডেলগুলি পরিয়ে দিয়েছেন কালি মাতাকেই। স্বপ্না বর্মণকে কোচিং নিতে যেতে হত আরএসএ-র মাঠ বা মল্লিকপাড়া হাইস্কুলের মাঠে। কোচিং নিতে যাওয়ার বাহন সেই ভ্যান রিক্সা। চালক পিতা পঞ্চানন বর্মণ। মেয়ে স্বপ্নার সঙ্গে সেই বাহনের যাত্রী থাকত মা বাসনা বর্মণ। 'দিন আনা-দিন খাওয়া' পরিবারের বাপ-মায়ের আর সব ফেলে এই আত্মনিয়োজন ভাবা যায় না, আগামী প্রজন্মের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

পার্থ প্রতিম রায় প্রধান

(১ অগাস্ট ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

অণিমা চৌধুরি

মাঝি

জলকে ঘিরেই তার জীবন, জলের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তার বেঁচে থাকা। সেই বেঁচে থাকার জন্য জলেই কেটে যায় তার সারাটা দিন। তবে স্বেচ্ছায় নয়, শুধুমাত্র সংসারের হাল ধরার তাগিদে নরম ওই হাত দুটোতে শক্ত করে ধরতে হয়েছে নৌকার হালটাকে। বছরের পর বছর ধরে সেই তাগিদেই নদীতে খেয়া পারাপার করে চলেছে অণিমা চৌধুরি। সম্ভবত সে-ই ডুয়ার্সের একমাত্র মেয়ে মাঝি।

কোচবিহারের কাছেই কালজানি নদী। নদীর একদিকে কালজানি, অন্যদিকে নাটাবাড়ি। এই কালজানি নদীতেই নৌকা চালায় অণিমা। যেই ঘাটে সে নৌকা পারাপার করে তার পোশাকি নাম বলরাম আবাস ঘাট। গ্রীষ্মকালে নদীর জল কিছুটা শুকিয়ে গেলেও ভরা বর্ষায় তার রূপ বেশ সমীহ করার মত। কিন্তু জলকে সে এতটুকু ভয় করে না। তাই তার নৌকায় শুধু মানুষ নয়, সাইকেল, বাইক থেকে শুরু করে কত কি যে সে এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায়, তা আর বলার নয়। যে দক্ষতার সঙ্গে অণিমা নৌকা পারাপার করে সেই একই দক্ষতায় যে কোনও পুরুষকে হার মানিয়ে সে নৌকা থেকে সাবধানে নামিয়ে দেয় যাত্রীদের সাইকেল মোটর সাইকেলগুলি। জন্মের পর থেকে সংসারে শুধু অভাবই দেখেছে সে। পাঁচ ভাইবোনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। খুব অল্প বয়সেই তাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সংসারের জোয়াল। জল আর জীবনের এই অসম যুদ্ধে তার স্বভাবেও এসে গিয়েছে একটা পুরুষালি ভাব। মা ভাইয়ের সংসার টানতে টানতে নিজের আর আলাদা করে সংসার পাতা হয়ে ওঠেনি। যাত্রীদের হাঁকডাকে নদীর পাড় লাগোয়া ছোট্ট বেড়ার বাড়িতে শান্তিতে বসে দুপুরে একটু খাবারও সময়ও নেই তার। সূর্য ওঠার পর থেকে সেই যে শুরু হয় যাত্রীদের পারাপার করানো, সন্ধ্যা পর্যন্ত

তা চলতেই থাকে। এই জীবনকে মেনেও নিয়েছিল অণিমা। কিন্তু জীবন যে তার কাছে আরও কঠিন পরীক্ষা নিতে চলছে।

উন্নয়ন সকলেই চায়, কিন্তু সকলের জীবনে তা খুশির বার্তা নিয়ে আসে না। অণিমার জীবনে এই উন্নয়ন একটা অনিশ্চয়তা বয়ে নিয়ে এসেছে। বহু বছর ধরেই কালজানি নদীর উপর একটা স্থায়ী সেতুর দাবি করে এসেছে স্থানীয় মানুষ। এই সেতু হয়ে গেলে নাটাবাড়ির লোকজনদের কোচবিহার আসার জন্য আর ঘুরপথে অসতে হবে না। দুই পাড়ের লোকেদেরও প্রচুর সুবিধা হবে এতে। সেই বহুকাঙ্খিত সেতুর কাজ শুরু হয়ে গেছে। শেষও হয়ে যাবে হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যে। তখন তো তার নৌকা ব্রাত্য হয়ে যাবে সাধারণের কাছে। সেই দিনের কথা ভাবতে গেলে সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবুও জীবনের যুদ্ধে এতটুকু হার মানতে রাজি নয় অণিমা। এই ঘাট ছেড়ে এবার হয়ত অন্য কোনও ঘাটে তার নৌকার ভেড়ার অপেক্ষা। কারণ সংসারের হাল ছাড়লে যে তার চলবে না।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(১৫ জুন ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

ঊর্মি চৌধুরী

সারেগামাপা খ্যাত গায়িকা

ঊর্মি তখন খুব ছোট, দুই কি তিন বছরের হবে। ওর দুরন্তপনায় সকলে অস্থির হয়ে থাকে সবসময়। বাবা-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমাও সারাটা দিন দৌড়চ্ছেন ওর পিছন পিছন। একদিন হয়েছে কি, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঊর্মিকে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ, কোথাও নেই। বাড়ি ছেড়ে খুঁজতে যাওয়া হল পাশের বাড়িতেও। সেখানেও নেই। যখন সকলের চিন্তার পারদ চড় চড় করে ওপরের দিকে উঠছে তখন তিনি বেরিয়ে এলেন আলমারির পাশের সরু ফাঁক থেকে। সেই উর্মিকে খুঁজতে হলে এখন শুধু ওর নামটাই যথেষ্ট। ঊর্মি চৌধুরী। ময়নাগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে নেমে ঊর্মি চৌধুরী বললেনই টোটো কিংবা রিকশা অনায়াসে নিয়ে যাবে সঠিক ঠিকানায়। নাতনির কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বাসে মুখ থেকে হাসি আর সরছিলই না বৃদ্ধা ঠাকুমার। এখন সেই মফস্বলের সহজ সরল মেয়েটার দিন কাটছে কলকাতায় জি বাংলার পার্পল স্টুডিওর নিয়মানুশাসনের গণ্ডীর মধ্যে, যা ওর গানের জীবনের জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি। জি সারেগামাপা-তে প্রায় রোজই দেখা যায় ঊর্মি চৌধুরীর মুখ, শোনা যায় ওর গান। স্ক্রিনে বাইরের দিন যাপনেও এখন শুধু গানই ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সকালে ঘুম থেকে উঠে রুটিনমাফিক কাজকর্ম্মের পাটটুকু চুকিয়ে চলে যেতে হয় ক্লাসে, গ্রুমিং চলে সারাটা দিন।

ঊর্মির ময়নাগুড়ির বাড়িতে যখন পৌঁছলাম সবে দুপুর গড়িয়েছে। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আমাদের পৌঁছনোর অপেক্ষাই করছিলেন ঊর্মির বাবা-মা। টিনের চাল, সামনে উঠোন, গেট পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকতেই একটা বড় কুল গাছ। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসতে দেওয়া হল এক্কেবারে ঠাকুমার ঘরে। বিছানায় বসে আছেন তিনি, সামনের চেয়ারে আমরা বসলাম। পরিচ্ছন্ন ঘরে অকারণ সাজের কৃত্রিমতা নেই। শহুরে চাকচিক্যের অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর এখনও ঢুকে পড়েনি ঊর্মির ছাপোষা আটপৌরে পরিবারের মধ্যে। জেঠুর সঙ্গে দেখা হল, দেখা হল পিসেমশাইয়ের সঙ্গেও। সকলের কত যে স্নেহের মেয়ে ঊর্মি তা তাঁদের চোখ-মুখের ভাষাই বলে দিচ্ছিল। ঊর্মিকে নিয়ে কথা বললাম অনেকক্ষণ সকলের সঙ্গে। কিন্তু পরিবারের মধ্যে কোথাও এক বিন্দুও অহংকার চোখে পড়ল না।

'ঊর্মি' এবং 'গান' এ দুটো যে কী করে একাকার হল সে ব্যাপারে আশ্চর্য সকলেই। বাড়িতে কোনওরকমই সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল না ওর ছোটবেলায়। না ছিল কোনও গান-বাজনার চল, না ছিল নাচের পরিবেশ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে মেয়েটার মধ্যে নাচের প্রতি অদম্য ঝোঁক দেখা যেতে লাগল খুব অল্প বয়স থেকে। স্কুলে, পাড়ায়, এর বাড়ি গিয়ে নাচ করত মনের আনন্দে, নিজের খুশিতে। শিখত না কোথাও। বাড়ি থেকে সায় ছিল না, আবার বারণও ছিল না। আসলে ওর নাচ নিয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করার মতো বিলাসিতাও ছিল না কারুর। তখন ময়নাগুড়ি গার্লস-এ পড়ছে ঊর্মি। ক্লাস এইট-নাইনে উঠতে উঠতে দেখা গেল নাচের পাশাপাশি গানের প্রতিও ওর তেমনই আগ্রহ। প্রতিবেশী একটি মেয়ে গান গাইত, ঊর্মি তার পাশে বসে শুনত। শুনতে শুনতে গলায় তুলেও ফেলত। একদিন তার গান শেখার ক্লাসে ঊর্মিকে নিয়ে গেল সে। কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্তই। মনে মনে খুব ইচ্ছে করত একটু হারমোনিয়াম বাজাতে। কিন্তু উপায় তো নেই। কোথায় পাবে হারমোনিয়াম। কে দেবে? বাবার কাছে চাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ, হারমোনিয়াম কিনে দেবার মতো শখের পিছনে ব্যয় করার মতো পয়সা নেই বাবার। অনেক কষ্টের উপার্জনের টাকা। পাড়ার আর একজনের কাছে হারমোনিয়াম ছিল। ও যেতে লাগল তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজানোর শখ একটু বলেও মিটল বটে কিন্তু নতুন গানগুলো প্র্যাকটিস করতে পারত না। কিন্তু ভিতরে অদম্য উৎসাহ।

বাবা দেখলেন বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর মেয়ের গানের গলা নিয়ে প্রশংসা ভেসে আসছে, তাই তালিম নেওয়ার জন্য ঠিক করে দিলেন একজন ভাল শিক্ষক, অশোক রায়। কিন্তু এতেও সমস্যা মিটল না। শুধু মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাওয়া আর আসাটাই চলতে লাগল, বাড়িতে একটা হারমোনিয়াম না থাকলে কি রেওয়াজ করা যায়। গান শেখা চলছে খালি গলায়। এরও বেশ কিছুদিন পর বাবা কষ্টে-শিষ্টে একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড হারমোনিয়াম কিনে দিলেন মেয়েকে। এই ঊর্মির গানের পথের যাত্রা হল শুরু। সংগীতের মধ্যে ডুবে গেল ঊর্মি। অশোক রায়ের পরবর্তী শিক্ষক হলেন জলপাইগুড়ির দেবাশিস বাগচি। ময়নাগুড়ি থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পর ঊর্মি চলে গেল কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হতে। এযাবৎ যদিও রবীন্দ্রসংগীতই ছিল ওর একমাত্র সাধনা, তবু পাশাপাশি চলছিল বিষ্ণুপুর ঘরানায় ধ্রুপদীসংগীতের তালিম। স্নাতকোত্তরের পর ডক্টরেট করার ইচ্ছে ছিল ঊর্মির। কিন্তু জি সারেগামাপা-এর অডিশনে এভাবে সুযোগ এসে যাবে তার জন্যে মনটা তৈরি ছিল না তখনও। এখন কাজ করতে গিয়ে জি বাংলার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ঊর্মিসহ ওর বাড়ির সকলে। 'গ্রাম-বাংলার একটি মেয়েকে যেভাবে একটা এত বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়া যায় তা জি বাংলা দেখিয়ে দিল,' বললেন ঊর্মির বাবা।

এখন জি-এর সঙ্গে কাজ করলেও এরপর পড়াশোনাটা অবশ্যই শেষ করবে ও। রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার সময়ই ওর শিক্ষকেরা ওকে গাইড করেন যাতে ও ফোক সং-এর দিকে যায়। গেলও তাই। তৈরি করল নিজের সিগনেচার ব্যান্ড 'একতারা'। গান শেখা আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা যখন চলছিল তখন ময়নাগুড়িতে নিজের বাড়ির মাঠে ঊর্মির উদ্যোগেই শুরু হয় রবীন্দ্রভারতীর ঢঙে বসন্ত উৎসবের আয়োজন। এখনও ময়নাগুড়িতে না থাকলেও অনুষ্ঠানটি কিন্তু ঠিকঠাকই চলে।

কথা বলতে বলতে চোখ ভিজে উঠছিল বাবার। মেমেন্টো, সার্টিফিকেট, মেডেল সব সাজিয়ে দিলেন আমাদের সামনে। বললেন, 'আমার মেয়ে বলেছে, বাবা, আমি আমার দুটো শখ পূরণ করতে চাই, প্রথমে একটা স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়াম কিনব, আর তারপর আমাদের বাড়িতে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলে বাথরুম বানাব।' তারপর বললেন, 'আমার মেয়েটাকে আজ পর্যন্ত একটা স্কেল চেঞ্জার কিনে দিতে পারিনি আমি। ও ওই ভাঙাচোরা সারাই করা সেকেন্ড হ্যান্ড হারমোনিয়াম দিয়েই চালিয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ওর গানের জন্য কোথায় না কোথায় নিয়ে গিয়েছি অমি। জি বাংলার অডিশনের দিনও তো, কি ভীষণ গরম, মাথার ওপর কড়া রোদ্দুর, উপচে পড়া ভিড়... এখন আমার সব পরিশ্রম সার্থক। মেয়ে আমার উপযুক্ত সম্মান রেখেছে।' বারবার বলতে লাগলেন, 'সবাই ছেলে ছেলে করে, কিন্তু আমি মেয়ের বাবা হয়ে বলছি, একটা উপযুক্ত মেয়ে দশটা ছেলের সমান হতে পারে।' কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে ঊর্মি। অত্যন্ত মনোযোগী এবং উন্মুক্ত ছাত্রী ছিল ও কালিকাপ্রসাদের, বিশেষ করে লোকগান যখন ওর সাবজেক্ট। শান্তনু মৈত্র সহ জি পরিবারের সকলের কাছে ঊর্মি অত্যন্ত স্নেহের, ভালবাসার।

ফিরে আসার সময় ঊর্মির মা বললেন, 'আমার ভাল লাগছে এটাই, আমার মেয়ে সকলের কাছে ময়নাগুড়িকে পৌঁছে দিল। যারা ময়নাগুড়িকে চিনত না জানত না, তারাও এখন আমাদের এই ছোট মফস্সল শহরটার নাম জানল, আমার মেয়ে তাদের চেনাল। ময়নাগুড়ি মানুষেরাও এতে দারুণ খুশি।'

শ্বেতা সরখেল

(১ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

বিষ্ণুপ্রিয়া পাল

মৃৎশিল্পী

কোচবিহার শহরের ২০ নং ওয়ার্ডের কুমোরটুলি। জেলার নামকরা মৃতশিল্পীদের বাস এই এলাকায়। এখানেই দেখা পাওয়া গেল কোচবিহার বা সম্ভবত ডুয়ার্সের সব চাইতে প্রবীণা মৃৎশিল্পী বিষ্ণুপ্রিয়া পালের। বয়েস যাঁকে এতটুকুও কাবু করতে পারেনি। ভোর

পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বিশ্রামের সাথে যার তেমন কোনও সখ্যতা নেই। ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়ে বললেন, 'কাজ না কইরা থাকতে পারি না'।

দিন মাস বছরের হিসেবটা কিছুটা গুলিয়ে গেলেও আজও জীবনীশক্তিতে ভরপুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় (অধুনা বাংলাদেশ) বাবা শরত পালের ছিল কাঁসা পিতলের ব্যবসা। ভাইবোনদের সঙ্গে পুতুল খেলতে খেলতেই মাত্র ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তার। শ্বশুরমশাই যতীন্দ্র মোহন পাল ছিলেন ঢাকারই একজন নামকরা মৃৎশিল্পী। শ্বশুরের কাছেই প্রথম মাটির পুতুল বানানো শেখে ছোট্ট বৌমাটি। সেই থেকে শুরু। সেই বয়সে রান্নাটাও ঠিকঠাক গুছিয়ে না করতে পারায় শাশুড়ির গঞ্জনার হাত থেকে সস্নেহে আড়াল করতেন শ্বশুরমশাই। বৌমাকে শেখাতেন নানান ধরনের পুতুল বানানো, মূর্তির হাত পা বানানো, বিভিন্ন প্রতিমা রং করা, তার সাজসজ্জা তৈরি করা ইত্যাদি। স্বামী নিত্যগোপাল পাল সারা বছরই প্রায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত মূর্তি বানানো আর মূর্তি বিক্রি করার জন্য। তাই বিয়ের পর স্বামীকে সেভাবে কাছেও পাননি বিষ্ণুপ্রিয়া। হঠাৎই ৬-৭ বছর বাদে সেই সুযোগ আসে। কাজের খোঁজ পেয়ে ঢাকা ছেড়ে কোচবিহারে চলে আসে তার স্বামী, সঙ্গে আসে বিষ্ণুপ্রিয়াও। শুরু হয় নতুন পরিবেশে নতুন সংসার। কোচবিহারে তখন খুব বেশি পুজো হত না। তখন রাজার আমল। তবুও মূর্তির বায়না পেত তারা, বায়না আসত আসাম থেকেও। এরই মধ্যে দেশ স্বাধীন হল। তিন ছেলে পাঁচ মেয়ের মা হল সে। সংসার সামলে শ্বশুরের কাছে শেখা পুতুল, বর-বৌ বানাতো সে। কোচবিহারের রাসমেলায়, রথের মেলায় সেগুলো বিক্রি হত। ততদিনে ভাড়াবাড়ি থেকে নিজেদের ছোট্ট একটা বাড়ি বানিয়েছে তার স্বামী।

এভাবে বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। হঠাৎই স্বামী মারা গেলেন। ছোট সন্তানদের নিয়ে সে সময় অথৈ জলে পড়ার অবস্থা। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হল তাকে। মূর্তি বানানোর জন্য কলকাতা, আলিপুরদুয়ার থেকে কারিগর আনিয়ে কাজ করানো হত। সেই অসময়ে নানাভাবে তাকে সাহায্য করেছেন পড়শি রমেশচন্দ্র পাল, কোচবিহারের অন্যতম মৃৎশিল্পী তিনি। সেই সাহায্যের কথা আজও মনে রেখেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। সে সময় প্রতিমার বায়না ধরা, চিলাখানা থেকে মাটি আনানো, কাজ দেখাশোনা করা, প্রতিমা রং করা সবটাই নিজে করতেন। একটাই আক্ষেপ ছিল যে কাঠামো গড়তে পারতেন না। তবুও একটা দিনের জন্যও কাজ বন্ধ হতে দেন নি। মহিলা বলে অনেকে খরিদ্দার ভাঙিয়ে নিতে চাইত। কিন্তু কারিগররা সে সময় খুব সাহায্য করায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে যায়নি। সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে আজও কষ্ট হয় তার। কোথা থেকে এত মনের জোর এত শক্তি পেয়েছিল জানেন না। তবে দমবার পাত্রী ছিলেন না তিনি। ছেলে বাদল পাল বড় হয়ে কাজ শেখায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। পরে মেজ ছেলে প্রদীপ পালও কাজ শিখে নেয়। এখন বাদল পালের তৈরি মূর্তি জেলার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যথেষ্ট সমাদৃত। জানালেন, সবটাই মায়ের জন্য। অনেক কাজ শিখেছি মায়ের কাছে। সেই সময় মা যেভাবে সবটা সামলেছেন তা বলার নয়। আজও এই ৯৩ বছর বয়সেও আমাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন পুজোর আগে কাজের চাপ পড়লে মা মূর্তি রং করা থেকে শুরু করে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেন।

এখন তার কারখানায় দুই ছেলে বাদে ১০ জন কারিগর খাটে। আগের চাইতে অনেক বড় হয়েছে তার কাজের জায়গা। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভালভাবে। ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনি নিয়ে এখন ভরা সংসার তার। এই বয়সেও ভোরবেলা উঠে সবার আগে সংসারের বাসি কাজ সেরে রাখেন তিনি। বৌমাদের সাহায্য করেন প্রয়োজনমত। কোনও সময় রান্নাও করেন। ঠাকুর পুজোও তাকে দিতে হয়। তার কথায়, 'আমি বয়্যা থাকতে পারি না'। একটা চোখে ছানি অপারেশন করানো হলেও তা সাকসেসফুল হয়নি। তাই সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ক্ষীণ। তবুও হারার পাত্রী তিনি নন, জানান, আমার তাতে কাজ করতে কোনও অসুবিধা হয় না। আজও নিপুন হাতে আঁকেন লক্ষ্মীর পট। ছাঁচের প্রতিমার রং করেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, অষ্টনাগসহ নানান মূর্তি রূপ পায় তাঁর হাতে। তবে এই কাজে তার একমাত্র নাতির কোনও আগ্রহ নেই। কোনও বৌমাও কাজ শিখল না। ছেলেদের পর এই কাজ ধরে রাখার আর কেউ থাকবে না। এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথায়।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(১৫ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

দীপিকা দে

রেলগেট প্রহরী

আলিপুরদুয়ারে যখন পৌঁছলাম আকাশভাঙা বৃষ্টিতে গাড়ির ওয়াইপারও ঠিকঠাক কাজ করতে পারছিল না। একে ওকে জিজ্ঞেস করে খুঁজতে লাগলাম আসাম গেট টু রেল গুমটি। আগেরদিনই খবর পেয়েছি এখানে রেলগেট ওঠানো নামানোর কাজটি করেন যে মহিলা তিনি এখন কয়েকদিন ধরে আসাম গেট টু-তে কর্মরত। আমাদের স্বাভাবিক চোখ মহিলাদের যেসব কাজে দেখে অভ্যস্ত দীপিকার কাজটা ঠিক সেরকম নয়। আর সেটাই ওঁর কাছে আমাদের পৌঁছে যাবার একমাত্র আকর্ষণের কারণ। গুমটিতে যখন পৌঁছলাম বৃষ্টিটা ধরেছে। ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে খুব ছোট্ট একটা চৌকি। বসে আছে বছর বাইশের একটি ছোট্ট-খাট্ট মেয়ে। দীপিকা দে। এই তো পাওয়া গেছে। আমি আর তন্দ্রা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপিকা একটু অস্বস্তিবোধ করেছিল প্রথমটায়। পরে অবশ্য স্বচ্ছন্দ হয়েই ওর কাজের ধরনটা নিজে হাতে দেখাল মেশিনের বোতামের ওপর হাত রেখে। যাতায়াত করা ট্রেনের সংখ্যা যদিও কম, তবুও ডিউটি আওয়ার হিসেবে বারো ঘণ্টা থাকতে হয় তার। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। স্টেশন মাস্টারের ফোনে ইনস্ট্রাকশন এলে তবেই রেল গুমটি বন্ধ করতে হয়।

যদিও বোতাম টিপেই কাজ হয় আজকাল, তবুও কখনও কখনও মেশিন খারাপ থাকলে শক্ত হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেট ওঠানো আর নামানোর কাজটাও তারই সারার কথা। তবে হ্যাঁ, 'আমার কলিগেরা খুব ভাল, ওটা এখনও আমার করতে হয়নি, ওনারাই করে দিয়েছেন,' মিষ্টি হেসে জানালেন দীপিকা। দীপিকার মতো আরও নাকি জনাদশেক এই একই কাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন ডুয়ার্সের বিভিন্ন গুমটিতে। তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছেন যারা এই হাতল ঘোরানোর কাজটিও একলাই সামলে নেন। প্রয়োজন হলে দীপিকাকেও তাই করতে হবে।

২০১০-এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৮ বছর পেরোতে না পেরোতেই চাকরি। বিয়ে হয়েছে এ বছর। শ্বশুরবাড়ি থেকেও সাপোর্ট পায় চাকরিটা বজায় রাখার জন্য। ওর সঙ্গে কথা বলে এটা অন্তত বুঝলাম, রেল গুমটির দায়িত্বে থাকা কর্মীর কাঁধে কত ভারি ওজন ভর করে থাকে। একদিকে দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা সামলানোর জন্য স্টেশন মাস্টার আছেন কিন্তু মাস্টারের ফোন পাওয়া থেকে শুরু করে নির্বিঘ্নে ট্রেন চলে যাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়ভার বইতে হয় ওকেই। ফলে ছোট হোক বা বড়, কম হোক কিংবা বেশি, দায়িত্ব দায়িত্বই। সেটা ঠিকঠাক সামলে নিলে নিজের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা থাকে না, অনেক অঘটনও এড়িয়ে চলা যায়।

শ্বেতা সরখেল

(১ অগাস্ট ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

সোনম মাহেশ্বরী

পুলিশ অফিসার

ঘড়ির কাঁটায় তখন মধ্যরাত। বাড়িতে সবাই যে যার মত ঘুমের জগতে। শীতের রাত। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মেয়েটা। হঠাৎই একটা অদ্ভুত শব্দে চমকে ওঠে। মনে হচ্ছে নীচে কে বা কারা গেট ভাঙছে! বরাবরই ভয়ডর

একটু কম মেয়েটার। তাই সময় নষ্ট না করে খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে ব্যালকনি দিয়ে উঁকি মারে নীচে। যা আশঙ্কা করছিল ঠিক তাই। বাড়ির সামনে জনা চল্লিশেক লোক তাদের বাড়ির নীচের গেটের তালা ভাঙছে। বাড়িতে যে ডাকাত পড়েছে তা বুঝতে আর বাকী থাকে না। ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বোনকে ডেকে তোলে। বাকিদের খবর দেবার আগেই ডাকাতরা ঘরে ঢুকে যায়। তার কদিন পর সরস্বতী পুজো। সেজন্য ব্যাংকের লকার থেকে গয়না বাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল। সে রাতে ডাকাতিতে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে মেয়েটি। একজন ডাকাতকে ঘুসিও মেরেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। ডাকাতেরা সে রাতে যা পেরেছে সোনাগয়না টাকাপয়সা সব নিয়ে চলে গেল। ওইসময় একটা বন্দুকের ভীষণ অভাব বোধ করেছিল কিশোরী মেয়েটা। বারবার শুধু একটা কথাই মনে আসছিল যদি একটা বন্দুক থাকত! তবে সবাইকে কাবু করে ফেলতে পারতাম।

সেই রাতের ডাকাতিটাই তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াল। এসব চোর ডাকাতকে শায়েস্তা করতে হলে হাতে একটা বন্দুক লাগবেই। আর একমাত্র পুলিশে চাকরি করতে পারলেই সেটা সম্ভব। তারপর কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল মেয়েটার। অবশেষে ইচ্ছাশক্তিরই জয় হল। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটাই তার বছর দশেক পর থেকে কোমরে রিভলবার নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। ঘুম উড়ে যায় অপরাধি সমাজবিরোধিদের। সেদিনের সেই মেয়েটাই আজকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার সোনম মাহেশ্বরী। গোটা কোচবিহার জেলা তো বটেই, রাজ্যের পুলিশ মহলের কাছে সোনম আজ পরিচিত নাম।

সেদিনের ডাকাতির ঘটনার পর খুব কাছের থেকে পুলিশ দেখার সুযোগ ঘটেছিল কিশোরি সোনমের। পুলিশ সেবার ডাকাতদের ৮-৯ জনকে পরে অ্যারেষ্ট করে, কিছু সোনা উদ্ধারেও তাদের সহযোগিতা করে। সেই ছোট্ট মনে পুলিশের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার দাগ কেটেছিল। স্বপ্ন দেখার শুরুটা হয় সেদিন থেকেই। মাধ্যমিকের পর কমার্স নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক। সেই পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট। এরপর কমার্স গ্রাজুয়েশন কোচবিহার কলেজ থেকে। স্কুল কলেজ সর্বত্রই বন্ধুমহলে যেমন জনপ্রিয় ছিল, তেমনি শিক্ষকদেরও প্রিয় পাত্রী। ছোট থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ, স্কুল কলেজে লং জাম্প থেকে শুরু করে ক্রিকেট সবেতেই স্বচ্ছন্দ। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করার অভ্যেস ছোট থেকেই। আর বন্ধুদের হয়ে অন্য কারুর সঙ্গে মারপিট করা তো ছিল রুটিন ব্যাপার।

মাস্টার্স করার পর বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিতে শুরু করেন সোনম। রেলে একটা চাকরি হয়েও যায়। কিন্তু সেই চাকরিতে জয়েন করেন নি। হঠাৎই সুযোগ এল পুলিশের চাকরির। সেদিন আর ইতস্তত করার প্রশ্নই ছিল না। বাড়ির লোকের পুরোপুরি সমর্থন ছিল তাঁর প্রতিটি কাজে। বিশেষ করে ঠাকুমা-র সমর্থন সবসময়ই পেয়েছেন। তাই মাড়োয়ারি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই পদক্ষেপ নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি সোনমের। ২০১৪তে পুলিশের চাকরিতে যোগদান, ১৩ মাসের ট্রেনিং ব্যারাকপুরে। ট্রেনিং চলাকালীন যেদিন প্রথম পিস্তল চালানো শেখানো হল, সেটা ছিল সোনমের জীবনের সবচেয়ে আনন্দ আর উত্তেজনার দিন, কিশোরী বেলার ইচ্ছেপূরণের দিন।

ট্রেনিং শেষ করে প্রথম পোস্টিং নিজের জেলায়। প্রভিশনাল হিসেবে মাথাভাঙ্গা থানায় কাজ শুরু। প্রথমেই তার নজরে এল ইভটিজিং। ব্যস রোড রোমিওদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে গেল মাথাভাঙ্গায়। কাগজে সে খবর ছাপা হতেই সকলের নজরে এল সোনম। সে সময়েরই একটা ঘটনা। রাত প্রায় আড়াইটা, দুজন কনস্টেবল নিয়ে সিতাই মোড়ে পেট্রলিং-এ ছিলেন সোনম। একটা মারুতি গাড়ি দেখে সন্দেহ হল। থামতে বললেও গাড়িটি দাঁড়াল না। এরপর ফিল্মি কায়দায় নিজেদের টাটা সুমো নিয়ে গাড়িটিকে তাড়া করে ধরে ফেললেন সোনম। গাড়িটির সিটের নীচ থেকে উদ্ধার হল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওরা ডাকাতির কোনও উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল।

সোনম মাহেশ্বরীর নাম জানতে শুরু করেছে কোচবিহারের মানুষ। এরপর কোচবিহার কোতোয়ালি থানা। যোগদানের মাত্র আট দিনের মাথায় বানেশ্বরের একটি ধর্ষণ মামলায় চার্জশিট দিলেন। কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ আগ্রহ দেখে এবার তাঁকে দেওয়া হল কোচবিহারের টাউন সাব ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব। পোষাকি নাম টাউন বাবু। রাজনগরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা টাউনবাবু।

কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস টিকে থাকতে পেরেছিলেন সোনম। এই পাঁচটা মাস কলেজের রাজনৈতিক গণ্ডগোলই হোক বা অন্য কোথাও কোনও অপরাধ, খবর পাওয়া মাত্র সোনম সেখানে হাজির। শহরে জুয়া সাট্টার ঠেক বন্ধ হওয়ার যোগাড়, ধরা পড়ল কয়েকটি হোটেলে চলা মধুচক্র, রাতে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো শিকেয় উঠল শহরের বহু নামী লোকেরও। কলেজ ছাত্রীদের কাছে হয়ে সোনম হয়ে উঠলেন প্রিয় দিদি। আর সদাতৎপর এই তরুণী অফিসারকে দেখে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে আশংকা করতে শুরু করলেন বাস্তবে তাই ঘটল। সোনম বদলি হয়ে গেলেন, দিনহাটা মহিলা থানার ওসি হিসেবে।

আর জীবনে নানান ঘা খেয়ে বড় হওয়া সচেতন নারীকুল মনে মনে সম্ভবত শঙ্কিত হয় —পারবে তো মেয়েটা বিশাল এই পুরুষতন্ত্রে লড়াই করে টিকে থাকতে? পারবে তো সোনম?

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(১ অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

নন্দিতা বাগচি

সাহিত্যিক

জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতি পাড়ায় জন্ম হলেও নন্দিতা মৈত্র (বাগচি)-র পুরো শৈশব কৈশোর জুড়ে ভরে আছে বীরপাড়ার কাছাকাছি 'তাসাতি' চা-বাগানের স্মৃতি। নন্দিতা মৈত্র'র বাবা বিভূতিভূষণ মৈত্র ছিলেন তাসাতি বাগানের ডাক্তার। বিরাট বড় বাংলো, সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে সবজি বাগান, ফুলের বাগান। সেখানে সারাদিন ধরে কাজ করত মালী। শুধু কি তাই? ছিল ধোপা, কাজের লোক, চৌকিদারও। সাবসিডাইসড রেটে পাওয়া যেন জ্বালানি, রেশন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা। ইউরোপিয়ান মালিকানার এই বাগানে কুলিদের এত আন্দোলন করতে দেখিনি তখন, বললেন নন্দিতা বাগচি। বললেন, 'কুলি লাইনে তেমন কোনও অসন্তোষ ছিল না। বাবা যেহেতু ডাক্তার ছিলেন তাই রাতবিরেতে অনেক সময়ই কুলিরা চলে আসত বাড়িতে চিকিৎসার জন্য। আমি বহুবার বাবার সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। সে সব দিন সারাজীবনেও ভুলবার নয়। এখন চা-বাগানের দুঃখের খবরগুলি শুনে বড্ড মন খারাপ করে। বীরপাড়া স্কুলে পড়বার সময় থেকেই শিক্ষক অর্ণব সেনের খুব প্রিয় ছাত্রী ছিলেন নন্দিতা। বিজ্ঞানে খুব ভাল হওয়া সত্ত্বেও নন্দিতা বাংলায় বরাবর সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন, তাই দেখে তিনি বারবার বলতেন, 'তুমি বাংলা নিয়ে পড়ো।' কিন্তু বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করবার মধ্যে তেমন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পেতেন না নন্দিতা। কিন্তু বাড়িতে সাহিত্যের আবহাওয়া থাকায় বাংলা-সাহিত্য কিন্তু শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। বাবা ডাক্তার হলেও তিনি লেখালেখি করতেন, বাড়িতে সাহিত্য পাঠের আসর বসাতেন। মা এসবের মধ্যে না থাকলেও প্রতিদিন তিনি সব কাজকর্ম সেরে উঠে মনযোগ দিয়ে অন্তত একটা করে চিঠি লিখতেন। তখন ছোট্ট নন্দিতা এর মর্ম না বুঝলেও পরে বুঝেছেন এসব চিঠিই ছিল মায়ের সাহিত্যচর্চা।

বীরপাড়া স্কুল পেরিয়ে আলিপুরদুয়ার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা। এখানেও বেণু দত্ত রায়ের দৃষ্টিগোচর এবং আশীর্বাদধন্যা হন। এরপর নন্দিতা মৈত্র কোচবিহারের ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নন্দিতা বাগচি হিসেবে প্রথমে চলে যান কলকাতা, তারপর দিল্লি এবং অবশেষে আফ্রিকার

নাইজেরিয়ায়। জায়গাটা ছিল উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়া আর ক্যামেরুনের সীমানায় 'মুবি'। সেখানে পনেরোটা বছর কাটানোর সময় নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে সেসব অভিজ্ঞতা কাহিনি দু'মলাটে বাঁধা পড়ে পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে। 'মুবি'তে থাকার সময় সেখানকার একটি 'ও লেভেল' স্কুলে (ক্লাস টেন পর্যন্ত) তিনি অঙ্কের শিক্ষিকা হিসেবে কাটিয়েছেন। এটি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। এই বছরগুলোতে বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্কই ছিল না। শুধু দু'জনে কথা বলতেন বাংলায়। ভারতীয়ও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় উত্তরপ্রদেশের, নয় পাঞ্জাবি অথবা অন্যান্য কোনও না কোনও রাজ্যের। ফলে মুখের ভাষা থাকত হয় হিন্দি কিংবা উর্দু। পাকিস্তান থেকে অনেক মানুষ এসে এখানে থাকায় উর্দুটাও জানা হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া শিখে ফেলতে হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষা। 'মুবি'তে থাকার সময় যুক্ত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ওমেনস ক্লাব-এর সঙ্গে। এই ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন একজন ইউরোপিয়ান মিশনারি। এই ক্লাবের কাজ ছিল গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে কম্বল বিলি করা, হাসপাতালে শিশুদের জন্য দুধের কৌটো দেওয়া, কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানাবিধ সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া। এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নন্দিতা।

১৯৮৭ সালে ভারতবর্ষ ফিরে এসে কলকাতায় যখন ধীর স্থিরভাবে একটি স্থায়ী ঠিকানা গড়লেন তখনই এতদিনকার চেপে থাকা বাংলা ভাষা যেন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে একেবারে গ্রাস করে ফেলল। শুরু করলেন লেখা। লিখতে লিখতেও কতরকম অভিজ্ঞতা। ছোট-বড় কত পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, আবার বাতিল হওয়ার কষ্টও পেয়েছেন বহুবার। তবু হার মেনে হাল ছাড়েননি। আসলে নেশায় পেয়ে বসেছে তো তখন। একে একে বেরোল বই— 'বৃষ্টির পুত্র-কন্যারা', 'ইতি তোমার মণি', 'সখা', 'সূর্যের ঘোড়াগুলি', 'সেই মোহনার ধারে', 'আলাপ', 'পরিযায়ী', 'কলম্বাসের নতুন পৃথিবী', 'ওয়ান্ডারলাস্ট', 'চিলমারীর বন্দর', আরও বেশ কয়েকটি। 'দেশ' পত্রিকায় এখন চলছে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস 'পুনর্বাসন'। তাঁর উপন্যাসগুলি নিয়ে সামগ্রিকভাবে একটা গবেষণা করছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। বিষয়— 'বর্তমানের মহিলা ঔপন্যাসিক'। এতে তাঁর কাজগুলি আরও শক্ত ও স্থায়ী জমিতে গাঁথা হওয়ার সুযোগ পেল।

মা হিসেবেও অত্যন্ত সতর্ক সচেতন ও সফল নন্দিতা বাগচি। নিজেরা আফ্রিকায় থাকলেও পুত্র ও কন্যার জন্য দিয়েছেন কলকাতার 'লা মার্টিনা' এবং কার্শিয়াং-এর 'ডাউহিল'-এর মতো স্কুলের পরিবেশ। ওরা যাতে বাংলার কাছাকাছি থাকার সুযোগ পায় এবং একটি বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে বাংলা ওদের পড়াশোনার অঙ্গ হিসেবেই থাকে সেটাই ছিল এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনের মূল লক্ষ্য। এখন তারা সাবলম্বী এবং যে যার কর্মক্ষেত্রে সদাব্যস্ত। নন্দিতা বাগচি'র এখনকার সারাক্ষণের সঙ্গী শুধু কলম।

'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে একটু কথা বলতে চাওয়ায় উৎসাহিত হয়ে অনেকক্ষণ সময় দিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর জন্ম ও পালন ভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে। দীর্ঘ সময় কথা বলতে বলতে ছুঁয়ে গেছেন কত না স্মৃতিকথা। তার সবটা লেখাও হয়ে উঠল না তাঁর প্রতি রইল আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

শ্বেতা সরখেল

(১ এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

পার্বতী বাউল

বাউল শিল্পী

পাহাড় ঘেরা থিরুবন্তপুরম। তারই শহরতলিতে সবুজে মোড়া 'একতারা বাউল সংগীত কলারী'। যেদিকেই চোখ যায় শুধুই সবুজ। গাছ আর গাছ। তাতে কত রকমের ফল ধরে আছে। সারাদিন সে সব গাছে পাখিদের কলতান। আর যখন সেখানে বাউলের একতারা আর গানের সুর ভেসে বেড়ায় তখন সেই পরিবেশ যেন এক অন্য মাত্রা পেয়ে গেছে। মনে হয় স্বর্গের খুব কাছাকাছি চলে গেলাম। এখানেই থাকেন পার্বতী বাউল। সুদূর কেরলে থেকেও মাঝে মধ্যেই তার মন ঘুরে বেড়ায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা প্রিয় শহর কোচবিহারে। স্মৃতিতে ফিরে আসে ফেলে আসা মেয়েবেলা। যেখানে সে ছিল সকলের প্রিয় মৌসুমী পাড়িয়াল।

বাবা রেলের চাকরি সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতেন। অসমের লখিমপুর ১৯৭৬ সালে মৌসুমীর জন্ম। বেড়ে ওঠা কোচবিহারে। প্রথমে ইন্দিরাদেবী পরে সুনীতি অ্যাকাডেমিতে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হওয়া। ছোট থেকেই ভীষণ সুন্দর নাচ করত মৌসুমী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ তার বাঁধা। পাশাপাশি ছিল আঁকার দক্ষতা। আর তাই আঁকা শেখাও চলত নিয়ম করে। বড় দুই দিদির মত তারও গানের গলা ছিল সুন্দর। সংগীতের তালিমও তখন থেকেই। কোচবিহারে থাকাকালীনই ভাওয়াইয়া সংগীতের উপর ভালবাসা। মাটির কাছাকাছি লোকগানের সেই সুর মৌসুমীকে খুব টানত। মাধ্যমিকের পর শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। সেখানে ক্যাম্পাসে আসতেন ফুলমালা নামে এক বাউল শিল্পী। তার গানে সারা ক্যাম্পাস যেন প্রেম আর ভক্তিরসে ভরে যেত। সেই সময় থেকেই বাউল গানের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল সে। পার্বতী বাউলের কথায়, 'ফুলমালাদির কাছেই প্রথম বাউল গান সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। কিছুদিন তার কাছে শিখিও। তার কাছেই জানতে পারি, বাউল গান শুধু গান নয়, এক ধরনের সাধনা। সত্যিকারের বাউল হতে গেলে তার জন্য গুরু ধরতে হয়।' এর পরই চলে তার গুরুর সন্ধান। বাউল গানের এই অন্তহীন পথের খোঁজ যে তাকে পেতেই হবে। আর ঠিক তখনই খোঁজ মেলে বাঁকুড়া জেলার ৮০ বছরের বৃদ্ধ সনাতন দাস বাউলের। অনেক কৃচ্ছসাধনের পর তার দীক্ষাগুরু মেলে। সাধনার পাশাপাশি চলে মাধুকরী বৃত্তি। বাউল সাধনা, বাউল সংগীত হল গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুই এখানে পথ দেখান। তিনিই শেখান সাধনা করতে গেলে কীভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। নিজেকে ভুলে সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যেতে হয়।

এভাবে কেটে যায় বেশ কয়েকটা বছর। বাউল গানের সঙ্গে নাচের সঠিক মুদ্রা, ডুগ্গি বাজানো এগুলো ততদিনে গুরুর তত্ত্বাবধানে শিখেছেন তিনি। এরপর সান্নিধ্য পেলেন শশাঙ্ক গোঁসাইয়ের। কিন্তু ৯৭ বছরের এই বাউল সাধক মহিলা হবার জন্য প্রথমেই তাকে নিতে অস্বীকার করলেন। বাউল চর্চা করার জন্য তার আশঙ্কা কতটা তীব্র তা দেখার জন্য নানা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তাকে যাচাই করলেন শশাঙ্ক গোঁসাই। কিন্তু হার মানতে হল পার্বতী বাউলের জেদ ও ইচ্ছাশক্তির কাছে। নতুন গুরু অসম্ভব নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে বাউল সংগীতের গভীরতা ব্যাপ্তি তার বিশালতা, বাউল সাধনার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা দিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে। যার ফল, আজ পার্বতী বাউল নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে কেরল ভ্রমণ। ততদিনে তিনি অনেকটাই পরিণত, পরিবর্তিত। সেখানে পার্বতী মন্দিরের এক বৃদ্ধ পুরোহিত তার নতুন নামকরণ করলেন— পার্বতী। ১৯৯৭ সালে বিয়ে করলেন কেরলের রবি গোপালন নাইয়ারকে। তিনি নিজেও একজন স্বনামধন্য শিল্পী। থিরুবন্তপুরমে দু'জনে মিলে তৈরি করেন এক বাউল আখড়া। যেখানে হয় বাউল সংগীতচর্চা, বাউল সাধনা, বিভিন্ন ঘরানার বাউল শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংগীতের আদান-প্রদান।

সারা বছরই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, বইমেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন পার্বতী বাউল। তিনি গানের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যকল্প এঁকে দেন শ্রোতা দর্শকদের মনে। ডান হাতে একতারা, কোমরের বাঁদিকে বাঁধা ডুগ্গি এবং পায়ে মোটা নুপুর— ছোটবেলার চুল আজ পা পর্যন্ত লম্বা লম্বা জটার রূপ নিয়েছে। গানের মধ্যে লীন হয়ে যখন তিনি ঘুরে ঘুরে নাচ করেন, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য, এক অসাধারণ অনুভূতি। ইতালিতে প্রতি বছর একটা বিশেষ সময় লোকসংগীতের কর্মশালা হয়। সেখানে বাউল সাধনা ও সংগীত নিয়ে তাকে আলোচনা করতে যেতে হয়। এখন আর আঁকার জন্য তেমন সময় না থাকলেও সুযোগ পেলেই আঁকতে ভাল লাগে তার। যদিও সেই আঁকার ধারন এখন আগের চেয়ে অনেকটাই অন্যরকম। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অপর্ণা সেনের বাংলা সিনেমা 'আরশি নগর'-এ তাকে দেখা গিয়েছে। সেখানে তার গাওয়া দুটি গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। 'সং অফ দ্য গ্রেট সেল' নামে বাউল গান ও সাধনার উপর একটি বই লিখেছেন তিনি। সেখানে তার নিজের কথা ছাড়াও নিজস্ব বেশ কিছু আঁকাও রয়েছে।

শত ব্যস্ততাতেও কিন্তু মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোকে। পার্বতী বাউলের ভাষায় 'লোকসংগীত আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই ছিল। আসামের বিহু, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া এইসব লোকসংগীত শুনতে শুনতে বড় হয়েছি, ভালবাসাও সেখান থেকেই।' ছোটবেলায় কোচবিহারে থাকার সময় কাছেই ছিল তোর্সা নদী। আর বাড়ির পাশেই থাকতেন সুশীলা ও ননীবালা বলে দুই বোন। তাদের পিসি বলে ডাকতেন তিনি। দোতারা বাজিয়ে তারা গান শোনাতেন ছোট্ট মৌসুমীকে। তাদের কাছ থেকে অনেক ভাওয়াইয়া গানও শিখেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে এই পরিবেশ, প্রকৃতি, সংগীত এবং ডুয়ার্সের শান্ত জীবন পার্বতী বাউলের জীবনে অনেকটা প্রভাব ফেলেছে। তিনি

বলেন, ‘ওইরকম গান ছোট থেকে শুনেছিলাম বলেই বোধহয় এত সহজে বাউল গানকে ভালবেসে ফেলেছি।’ উত্তরবঙ্গ বিশেষত কোচবিহার তার স্মৃতিতে ঘুরে ফিরে আসে বারবার। সেইসব রাস্তাঘাট, স্কুলের মাঠ, আমলকিতলা টিফিন ঘর...। শেষবার কোচবিহার আসা হয়েছিল ২০০৪ সালে। কোচবিহারের সেই ছোট্ট মৌসুমী আজ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। তার জগৎ এখন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক আলাদা। তিনি বাউল সংগীতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চান। তার গুরুদেব গানকে বিলিয়ে দিতে চান সব মানুষের মনে। কারণ তার মতে, সংগীতের কোনও সীমানা নেই। কোনও পাঁচিল নেই। কোনও গণ্ডীতে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। এর কোনও ভাষা হয় না। তবে বাউল গান বোঝার জন্য চাই অন্য দৃষ্টিভঙ্গি। এর ভাষা বাংলা হলেও সকল বাংলাভাষীই কি এর অর্থ বোঝে? না হলে এত এত বিদেশিরা বাউল গানের জন্য উন্মাদ হয় কেন? বিদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরাও অনায়াসে এর ভাব অনুধাবন করতে পারে। বাউল গানের জাদুতে মুগ্ধ হয়। কারণ বাউল সংগীত মানুষকে অন্য একটা মানসিক স্তরে নিয়ে যায়। যেখানে চেতনার জাগরণ ঘটে। পার্বতী বাউল বলেন, বাউল সংগীতের মধ্যে এত বিশালতা রয়েয়ে যে, সে যে কোনও ধরনের, যে কোনও ধর্মের মানুষকে গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তিনি নিজের বাউল গান নিয়ে অনুষ্ঠান করে এসেছেন। বিদেশের শ্রোতারা পার্বতী বাউলের পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে বাউল সংগীত আত্মস্থ করতে চায়। পার্বতী বাউল বলেন, নিজের অহংকে ভুলে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সাধনার মধ্যে সমর্পণ না করতে পারলে, গানের মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। বাউল একটা endless journey— এই জগতের আনন্দ অপার। আর তাই পার্বতী বাউল সেই অনন্তের সন্ধানে তার একতারাকে সঙ্গী করে আরও হেঁটে যেতে চান এক অন্তহীন পথ।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(১ মার্চ ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

রেমিকা থাপা

নেপালি ভাষায় প্রথম গীতাঞ্জলী অনুবাদ

সারা বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ হলেও নেপালি ভাষায় গীতাঞ্জলী ছিল না তখন পর্যন্ত। তাঁর হাতেই প্রথম সেই কাজটি সম্পন্ন হয়। সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রানুরাগীরা বিভিন্নভাবে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সিকিম অ্যাকাডেমি উদ্যোগ নেয় গীতাঞ্জলীকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করতে। মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রেমিকা থাপা’র সঙ্গে এ বিষয়ে অ্যাকাডেমি যোগাযোগ করলে রবীন্দ্রানুরাগী রেমিকা ওই কাজে উৎসাহ দেখান। কিন্তু এরপরই তাঁকে একটা বিরাট সমস্যার সামনে পড়তে হয়। তিনি যে বাংলা ভাষাটাই জানে না! আর ভাষা না জেনে মূল কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ তিনি করবেন কীভাবে। সেই তাগিদ থেকেই বাংলা শেখা শুরু। উৎসাহী রেমিকার বাংলা হরফ লিখতে ও পড়তে বেশি দিন সময় লাগল না। সংসার, অধ্যাপনা সামলে তিনি নিজেকে যোগ্য করে তুললেন গীতাঞ্জলী অনুবাদের জন্য।

রেমিকা থাপা’র জন্ম রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য কালিম্পঙের মংপুতে নেপালি পরিবারে। মেয়েবেলার দিনগুলো কেটেছে পাহাড় ঘেরা সেই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। পড়াশোনার শুরু সেখানেই। সরস্বতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, তারপর দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও নেপালি ভাষায় স্নাতক হন তিনি। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। ওই সময় বাংলা কথা অল্প স্বল্প বুঝতে শিখেছিলেন রেমিকা তার বাঙালি বন্ধুদের সান্নিধ্যে, ভাঙা ভাঙা বলতেও পারতেন।

স্কুলে পড়াকালীন পাঠ্যপুস্তকের দৌলতে দু-একটি রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে পরিচয়। মংপু রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় স্থান। যার নিদর্শন আজও রয়েছে। সেখানে বেড়ে ওঠায় রবীন্দ্রনাথকে ছোট থেকেই জেনেছিলেন তিনি। এরপর মালবাজার কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে শিলিগুড়িতে থাকতে শুরু করেন। ফলে বাংলা ভাষার আরও কাছাকাছি আসেন তিনি। কিন্তু যখন গীতাঞ্জলী অনুবাদের কাজে হাত দিতে গেলেন, তখনই বাংলা ভাষাটি ঠিকমত জানার ও শেখার গুরুত্ব অনুভব করলেন তিনি।

রেমিকা থাপা’র কথায়, ‘এমনিতেই অনুবাদ মোটেই সহজ নয়। তার উপর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী। আমি কখনও চাইনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করতে। তাতে কবিতার প্রতি সঠিক বিচার হত না। মূল কবিতা থেকেই আমি অনুবাদ করতে চেয়েছি। তাই নিজের চেষ্টায়, সহকর্মীদের সহযোগিতায় আর অবশ্যই কম্পিউটারের সাহায্যে বাংলা ভাষা লিখতে-পড়তে শিখে নিই। তারপর গীতাঞ্জলী অনুবাদের কাজে হাত দিই।’ ২০০৮ সালে অনুবাদের কাজ শুরু করেন তিনি। ১৫৭টি কবিতাই নেপালিতে অনুবাদ করেন। শেষ হয় ২০১০ সালে। সিকিম আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয় গীতাঞ্জলীর নেপালি অনুবাদ। সেটা ছিল গীতাঞ্জলী রচনার শতবর্ষ পূর্তি।

কবিতাগুলির মূল ভাবকে বজায় রেখে রেমিকা থাপার তাঁর অনুবাদকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন সে তো নেপালিভাষী পাঠক বলবেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা কিংবা সাহিত্যের প্রতি চূড়ান্ত টান থাকলেই এ কাজ সম্ভব নয়। একজন অবাঙালির পক্ষে বাংলা ভাষাকে একান্তভাবে আপন করে নিতে পারলেই পাঠকহৃদয় জয় করা যেতে পারে। তবে তাঁর এই অনুবাদকর্মে রবীন্দ্রানুরাগীরা যে খুশি তা বলাই যায়।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

(১ মে ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

মিতালি রায়

বিধায়ক

ধূপগুড়িতে ঢোকার আগে স্টেশনের কাছাকাছি একটি পেট্রলপাম্পে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বাড়ির হদিশ পেলাম। পাম্পটা ওনারই। বিধায়ক মিতালি রায়ের। পাম্পের ঠিক পেছনেই ওঁর বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় বসে থাকা ভদ্রমহিলাকে দেখে স্পষ্টই বুঝলাম একজন সহজ সরল অকৃত্রিম মানুষ যার বাহ্যিক সাজের আড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নেই। ম্যাক্সির ওপর একটি দোপাট্টা জড়িয়ে বসে আছেন আর অসম্ভব সুন্দর রাজবংশীতে অনর্গল কথা বলে চলেছেন অত্যন্ত সাধারণ একটি মোবাইল ফোন থেকে। খুট্টিমারির কোনও সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছে মনে হল। একটু পরেই তাঁকে পৌঁছতে হবে সেখানে। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকায় ‘এখন ডুয়ার্স’-এর জন্য সময় রেখেছিলেন সকাল সাড়ে দশটায়। হাসি মুখে আপ্যায়ন করলেন চা-বিস্কুট দিয়ে। ব্যবহারে মনে হল যেন কতদিনের চেনা। জীবনের নানান গল্প এবং একজন মহিলা হিসেবে এগিয়ে চলার পথের ক্ষেত্রে সুবিধে অসুবিধে বাধাবিঘ্ন এসবের কথা জানতে চাইলে একের পর এক বলে গেলেন মনের ভেতরকার জমে থাকা কষ্টের কথা, আবেগবিহ্বল হয়ে পড়লেন মাঝে মাঝে।

বুকের ভেতর বারুদ তৈরি হয়েছিল যখন তিনি মাত্র ক্লাস নাইন। ১৯৮৬-৮৭র কথা। তিনভাই তিনবোন ওঁরা। দুই দাদার একজন সে সময় আইটিআই পাশ করেছেন সবে, একজন ইতিহাস নিয়ে সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন, দিদিও তেমনই ইলেভেন কি টুয়েলভ হবে, ছোট ভাইটা মাত্র ক্লাস ফাইভ। বাবা অ্যারেস্ট হলেন এবং জামিন নামঞ্জুর হল। মাকেও বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হয়েছিল বাইরে। ধূপগুড়ির বাড়িতে তখন শুধু ছোটরা। বাবা একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ এবং উপার্জন বলতে সবটাই জমি তথা আবাদি নির্ভর হওয়ার ফলে ঘরের সঞ্চিত খাবার ফুরিয়ে যেতে লাগল ক্রমেই। একটা সময় উপস্থিত হল শুধু খুদ জ্বাল দিয়ে খেতে হয়েছে ওঁদের। এইটুকুই নয়, পাশাপাশি চলছিল পুলিশি অত্যাচার। — ‘বাড়িতে ঢুকে দাদাদের যাকে পেত তাকেই মারত পুলিশ। আমার দাদাকে কীভাবে মেরেছে আমার চোখের সামনে আমি দেখেছি, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না আপনাকে। পুলিশের অত্যাচার কেমন হয় তা আমার জীবন দিয়ে বোঝা। ৫৭ থেকে ৭৭ যে সময়টা কংগ্রেস পার্টির জমানা ছিল সে সময় বাবা কংগ্রেস করতেন এমনকি ক্যাবিনেট মিনিস্টারও ছিলেন, সেকারণেই হয়ত বা অত্যাচারের পরিমাণটাও বেশি

ছিল, কেননা এটা ছিল বাম আমল।'

অবশেষে কংগ্রেসেরই একজন ক্ষমতাবান নেতার হস্তক্ষেপে এই মামলা থেকে রেহাই পান মিতালির বাবা। এরপর প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় ডেয়ারির লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, সেখানেও ঝড়ঝাপটা সামলাতে হয়, যাইহোক এরপর এসটিডি বুথের লাইসেন্স এবং পেট্রলপাম্প পাওয়ায় সামলে ওঠেন তিনি। এই ঘটনা থেকেই মনের ভেতর অগ্নিস্ফুলিঙ্গর জন্ম নেয় মিতালির যা পরবর্তীকালে কামতাপুর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁকে। মাধ্যমিক পাশ করে ধূপগুড়িতে যখন কলেজে পড়েন তখন ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন, অবশ্যই যুব কংগ্রেস। মমতা ব্যানার্জী তখন যুব কংগ্রেসের নেত্রী। এরপর যখন মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে মূল প্রদেশ কংগ্রেসের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ফলস্বরূপ জন্ম নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের, মিতালি রায় তখন চলে যান কামতাপুর পিপলস্ পার্টিতে। নিরানব্বইতে একটি বনধ্-এর দিন পিকেটিং করতে গিয়ে একমাত্র মহিলা পিকেটার হিসেবে অ্যারেস্ট হন মিতালি। এই তাঁর জনসমক্ষে আসা। কামতাপুর পিপলস্ পার্টিতে যোগদান করে বহু দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ, বিপ্লব চলতে থাকে প্রশাসনের সঙ্গে।

ফিরে আসবার তেমন কোনও ইচ্ছেই ছিল না সে সময়। কিন্তু বারবার করে ডাক তাঁকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করে। দুটো চিন্তা মাথায় কাজ করে মিতালির —'চন্দনদা, খগেশ্বরদা, মুকুলদা এঁদের মতো মানুষের অনুরোধ ফেলতে খারাপ লেগেছে এবং সর্বোপরি তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব নিজে এসে বলাতে আমি আর না করতে পারিনি। এঁরা যে কারণে আমাকে তৃণমূলে যোগদান করতে বলেছেন সেটাও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে আমার। কামতাপুর আন্দোলনের যে চাওয়া-পাওয়া রয়েছে সেগুলোকে পরিপূর্ণতা দিতে হলে এখানে আসাটা জরুরি। ফলে প্রথমবার ভাববার পর, দ্বিতীয়বার ভাববার পর তৃতীয়বার আর ভাববার কোনও জায়গা রইল না। নিজের দলের লোকেদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে সকলকে বোঝাতে পারলাম যে, সমাজের হয়ে কাজ করতে হলে এই প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া উচিত। সকলে একমত হলাম। তারপর ভোটে দাঁড়ানো। অবশেষে বিধায়ক।

কাজ করতে গিয়ে মিতালি বুঝলেন পৌর এলাকায় প্রায় ৮৫ শতাংশ কাজই হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলগুলোতে নজর দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাজ হয়েও গিয়েছে। বেশ কিছু কাজ হওয়ার মুখে। বিধায়ক হিসেবে একটা ব্যাপারে উনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, কাজের ক্ষেত্রে একটা বড় সুবিধে পান তিনি, আর কেউ পান কিনা ওনার ঠিক জানা নেই, আবার সেটা মহিলা হবার জন্যেই কিনা তাও জানেন না, সেটা হল, তাঁর কাগজপত্র কোথাও কখনও পড়ে থাকে না, খুব চটপট সই-সাবুদ ইত্যাদি হয়ে যায়। ফলে কাজ করাটা অনেকটাই সুবিধেজনক হয়। এখন যেদিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়ার ইচ্ছে সেটা হল সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে চাঙ্গা করা। সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোতে যে লোন দেওয়া হচ্ছে সে টাকা তারা অন্য খাতে ব্যয় করে ফেলছে, ফলে লোন ঠিকঠাক শোধ করতে পারছে না। এভাবে চলতে থাকলে ৮০ শতাংশ গ্রুপই ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাবে। মিতালি রায় যেহেতু নিজে সেলফ হেল্প গ্রুপের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার তাই এই দুর্বল দিকটা ঠিক করা এই মুহূর্তে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করছেন তিনি। তিনি মনে করছেন, এই সেলফ হেল্প গ্রুপের চিন্তাভাবনার দিকটি এত ভাল যে এটি সঠিকভাবে চালাতে পারলে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা অনেকাংশেই সার্থক হবে। এবং মহিলারা স্বনির্ভর হলে সামাজিক উন্নতি নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটাই দূর হবে। হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা যখন কোথাও মঞ্চে উঠি একসাথে খুব ভাল লাগে আমাদের, পরপর দাঁড়াই আমরা, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাপতি, আমি বিধায়ক, এসডিও ম্যাডাম, ডিএম ম্যাডাম, এডিএম কন্যাশ্রী, ডিপিএলও ম্যাডাম এবং সিএম। সবাই আমার মহিলা। নিজেদেরই ভাল লাগে"।

পারিবারিক সহযোগিতার কথা জিজ্ঞেস করাতে অনায়াসে বললেন, স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পান, ফলে কোন অসুবিধা হয় না। একমাত্র মেয়ে এখন ক্লাস টু-তে পড়ে। যদ্দিন শুধু রাজনীতি করেছেন তদ্দিন সন্ধেবেলা নিজেই পড়িয়েছেন মেয়েকে। এখন ওর বাবা পড়ান। এবং মেয়েও সেটা বোঝে, মায়ের ব্যস্ততায় মা ওকে আগের মতো সময় দিতে পারেন না। ঘুম থেকে উঠে বাসি বিছানায় মা-মেয়ের খেলা চলে অনেকক্ষণ। ওটাই ওঁদের কোয়ালিটি টাইম। তারপর ও-ও কিন্তু খুশি হয়ে যায়। ছেড়ে দেয় মাকে। প্রশ্ন করেছিলাম অল্প বয়সের প্রেম নিয়ে। হাসিটাই অন্যরকম হয়ে গেল। হয়ত বা মনের ভেতর কোনও ছবি ভেসে উঠেছিল। একটু এড়িয়ে যাওয়ার মতো করে বললেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল। আবার চলেও গিয়েছে। ছোট বয়সে যেরকম হয় আরকি'। এমএলএ হোস্টেলে নিজেই রান্না করেন শুনেছি, তাই কি? জিজ্ঞেস করলাম। ওঁকে। বললেন, 'আমার রান্না-বান্নার সবকিছু আছে ওখানে, আমি নিজেরটা নিজে করে নিতে ভালবাসি'। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে লাফা শাক এক নম্বরে। তবে খাবার পছন্দের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। সবই খান। ঘরকন্নার গল্প করতে গিয়ে বললেন, 'স্বামীর জন্য অনেকরকম রান্না আমাকে করতেই হয়। বিশেষ করে শুক্তো, ওটা তো উনি আমার হাতে ছাড়া খাবেনই না। সবরকম সবজি এনে দিয়ে বললেন, এটা তুমি করে দিয়ে যাও, ফলে ওটা আমাকেই করতে হয়। এছাড়া উনি পাতলা ডালের জল খুব পছন্দ করেন, পছন্দ করেন ইলিশ ভাপা কিংবা সর্ষে ইলিশ আর ছোট মাছের পাতলা ঝোল। সবজির মধ্যে পছন্দ করেন আলু পোস্ত, পুঁইশাক কুমড়ো আর মাছের কাঁটা দিয়ে, তাছাড়া রেড মিট বা চিকেন তো আছেই। এসব রান্নাও আমাকে করতে হয় কখনও সখনও। এখন সময় কম পাই বলে সবটা সব সময় করে উঠতে পারি না (শুক্তো ছাড়া), তবু চেষ্টা করি'।

ঈশ্বরের প্রতি অগাধ সম্ভ্রম দেখলাম মিতালি রায়ের। ধর্মে বিশ্বাসী এই মানুষটির কাছে শুনলাম সন্তানকে নিয়ে তাঁর জীবন-দর্শনের কথা। সন্তানেরা তো আমাদের নয়। ওরা তো ভগবানের। আমরা তো ওদের দাস। ওরা কী হবে না হবে সবটাই ঠিক করে দিয়েছেন ওপরওয়ালা, সেসব আমাদের হাতে নেই। আমাদের দায়িত্ব ওদের খাওয়া পরা দিয়ে বড় করা, কারণ সে দায়িত্ব তিনিই আমাদের দিয়েছেন, অতএব পালন করতেই হবে। ব্যস্, এটুকুই। আর শুধু 'ব্রহ্ম নাম' দিয়ে যেতে হবে তাকে, যেটা আমরা অনেকেই করি না। তিনি কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কর্তব্যে ত্রুটি করেন না কখনও। এখানেই তিনি অনন্যা। এখানেই তিনি শক্তির প্রতিমূর্তি।

শ্বেতা সরখেল

(অক্টোবর ২০১৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

নিজের জায়গার মত পূর্ণিমা-অমাবস্যার রূপ দেখি নি কোথাও !

মিতালি রায়

আমার মেয়েবেলা জুড়ে বিছিয়ে আছে আমার 'ছেলেবেলা'। মেয়ে হলেও আমার মধ্যে একটা ডানপিটে ছেলে ছিল। যতই সব বদলাক, সেই দিনগুলো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আমার স্মৃতি থেকে। ভাবলেই

আনন্দ পাই এখনও।

আমরা তিন ভাই তিন বোন। আমার ওপরে দুই দাদা আর দুই দিদি আর আমার পরে ছোট এক ভাই। দুই দাদা আর দুই দিদি ছিলেন আমাদের প্রথম পক্ষের মায়ের। ওই মা মারা গেলে বাবা আমার মা-কে বিয়ে করলেন। তাঁর কোলে আমরা দুই ভাই-বোন। তবে আমাদের দেখে কেউ কোনওদিন বুঝতে পারেনি যে আমরা এক মায়ের পেটের নয়। আমি, মেজদি আর ভাই তিনজনে ছিলাম খুব বন্ধু। যত দুষ্টুমি, সব আমরা তিনজনে। কিন্তু, আমার মা, মেজদি আর ছোট ভাইকে চরম পক্ষপাতিত্ব করতেন। দোষ করতাম তিনজনেই অথচ সবকটা মার আমার পিঠেই পড়ত। কী অশান্তি বল তো! যদিও তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ কিংবা অভিমান ছিল না কোনদিনই। আসলে থাকা উচিত কিনা সেটা নিয়ে মাথাই ঘামাইনি কোনওদিন। নিজেদের মধ্যেই রাগারাগি ঝগড়াঝাটি করতাম আবার ভুলে গিয়ে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতেও পারতাম না। আমাদের বাড়িতে গান বাজনার পরিবেশটাও খুব ভাল লাগত আমার। বড়দা খুব ভাল সেতার বাজাতেন। আর এক দাদা গিটার বাজাতেন। তবলা, গান সব কিছুই আজও মনে পড়ে। আমি খুব ভাল খেলতাম। হাই জাম্প, লং জাম্প, শট পাট, জাভলিন থ্রো, সাইকেল

রেস, অনেক প্রাইজ আছে আমার। শুধু অবশ্য সেগুলোই না, ছেলেদের মত গুলিও খেলতাম। নিজেই ভোরবেলা উঠে দৌড়তাম।

আমরা তিনজনে, মানে আমি, মেজদি আর ভাই, একসাথে পড়তে বসতাম। তখন খুব লোডশেডিং হত বলে বিকেল থাকতেই হ্যারিকেন, কুপি আর টেবিল ল্যাম্পে কেরোসিন ভরে ফিতে উঠিয়ে রেডি করে রাখা থাকত। মা-ই করতেন এসব। লোডশেডিং মানে কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। মা রান্নাঘরে কুপি নেবেন, এটা সর্বসম্মতভাবে মান্য। কিন্তু আমরা পড়তে বসে হ্যারিকেন নেব না টেবিল ল্যাম্প এই নিয়ে বেধে যেত ধুন্ধুমার লড়াই। টেবিল ল্যাম্পের গ্ল্যামারটা একটু বেশি ছিল, ফলে ওটার ওপর আমাদের একটু দুর্বলতা বেশি। কিন্তু ওতে সমস্যা হল, কাঁচের ল্যাম্পের ওপরটা ফাঁকা বলে নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তাই যতই টেবিল ল্যাম্প নিয়ে টানাটানি করিনা কেন, শেষমেশ হ্যারিকেন নিয়েই বসতে হত। একটা হ্যারিকেন। তিনদিকে আমরা তিনজন। পড়া শুরু হল। ভাই আস্তে করে নিজের দিকে হ্যারিকেনটা টেনে নিল একটু। আমি মুখে কিছু না বলে আমার দিকে টেনে নিলাম। দিদি বলল, এ কি আমি আলো পাচ্ছিনা তো, আমাকে দে। দিদি টেনে নিল। ভাই চেঁচাল, আমি কী করে পড়ব, আমার এখানে তো আলোই নেই, বলেই ভাই টেনে নিতে গেল যেই আমিও টানতে লাগলাম। অবশেষে হ্যারিকেন টানাটানি আর চিল্লামিল্লির চোটে মা রান্নাঘর থেকে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এসে মারতে যাবে যেই অমনি দিদি আর ভাই নেই। পেল আমাকে। কষে পড়ল ঘা। আমি ওদের মত সুড়ুৎ করে পালাতে পারতাম না বলে আমিই ধরা পড়তাম, আর সবার তরফের মার আমার একলার খেতে হত। প্রতিদিন পড়াশুনো মানেই সন্ধ্যেবেলার এই এক নিয়মিত দৃশ্য।

আমাদের বাড়িতে যে চাকিন্দার ছিল তার নাম ছিল ক্ষেত্র। আমি ডাকতাম দাদা বলে। বাড়ির যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ছিল ওই ক্ষেত্রদার ওপর। আমি ক্ষেত্রদার লেজে লেজে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের বাড়ির পেছনেই একটা মরা নদী ছিল। ক্ষেত্রদা ওখানে মাছ ধরতে যেত। ছিপ, মাছের টোপ সব নিয়ে দাদা এগোচ্ছে আর আমি হাঁড়ি ধরে ওর পেছন পেছন। ভাবখানা বিজ্ঞের মত।

ধান কাটার পরে প্রচুর শিস ঝরে পড়ত। ওগুলো কুড়োতাম আমি। দায়িত্ব সহকারে। সারা মাঠ জুড়ে প্রচুর ধান পড়ে থাকত যেগুলো আর তোলা যেত না। গরু ছুটিয়ে ওই ধান ঝাড়তে হত। আমি সেই সেনাপতি যে গরু ছোটাতাম। আমার তাড়া খেয়ে গরু লেজ উঠিয়ে সে কি দৌড় দিত, এখনো ভাবলে একা একাই হাসি পায়। গরুকে ওইভাবেই দৌড় পাড়াতে হত যাতে ওর খুরের চাপে ধান মাড়াই হয়ে যেত। এই ধরণের যে কোনও কাজে আমার আপত্তি তো থাকতই না, বরং আমি দারুণ মজা পেতাম করতে।

ক্ষেত্রদার সঙ্গে যখন মাছ মারতে যেতাম তখন কচুরিপানা সরিয়ে সরিয়ে মাছ খুঁজতে হত। হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে কাদা থেকে মাছ খুঁজে বের করতে ক্ষেত্রদাই শিখিয়ে দিয়েছিল। দুজনে মিলে সে কি ধুম মাছ ধরার। এখনকার সময়ের অনেক ছেলেমেয়েকে দেখলে মনে মনে খুব কষ্ট হয়। ভাবি, যে, ওরা এসব মজার কিছুই জানল না, বুঝলোও না। এই বাঁধনহীন ছেলেবেলার মজা আজও আমাকে ভাল রাখে, তাজা রাখে। সুপুরি গাছে কম চড়েছি? পড়েও গেছি। হাত-পায়ে কাটা ছড়ায় ভর্তি থাকত আমার।

পাট উঠত যখন, তখন পাটকাঠিকে শুকিয়ে তুলে রাখা হত জ্বালানি হবে বলে। মা নিজে খুব পরিপাটি ছিলেন সব ব্যাপারে। নিজেও খুব টিপটপ থাকতে পছন্দ করতেন। যে কোনও কাজের বেলাতেই পরিপাটি না হলে ওঁর ভাল লাগত না। ওই পাটকাঠির গায়ের তুলো তুলো যে আঁশ লেগে থাকে তা দেখতে পারতেন

ক্ষেত্রদার সঙ্গে যখন মাছ মারতে যেতাম তখন কচুরিপানা সরিয়ে সরিয়ে মাছ খুঁজতে হত। হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে কাদা থেকে মাছ খুঁজে বের করতে ক্ষেত্রদাই শিখিয়ে দিয়েছিল। দুজনে মিলে সে কি ধুম মাছ ধরার। এখনকার সময়ের অনেক ছেলেমেয়েকে দেখলে মনে মনে খুব কষ্ট হয়। ভাবি, যে, ওরা এসব মজার কিছুই জানল না, বুঝলোও না। এই বাঁধনহীন ছেলেবেলার মজা আজও আমাকে ভাল রাখে, তাজা রাখে।

না। ওগুলো পরিষ্কার করে বেছে তবে গুছিয়ে গুছিয়ে জড়ো করে রাখতেন। এর পেছনে আর একটা কারণও আছে। ওই আঁশ থেকে অনেক সময়ই আশেপাশে আগুন লেগে যাওয়ার একটা ভয় থেকেই যেত। আমাদের বাড়ির সামনের দিকে দুটো ঘর ছিল। একটা ছিল বাবার অফিস ঘর, আর মাঝখানে বেশ খানিকটা উঠোন পেরিয়ে আর একটা ঘর। ওটায় আমরা তিন ভাই-বোন দিনের বেলায় পড়তে বসতাম। একদিনকার ঘটনা বলি। মা উঠোনে বসে পাটের আঁশ পরিষ্কার করছেন আর আমরা তিনজনে পড়তে বসেছি ওই ঘরে। আমদের পড়তে বসা মানে তো সেই ধুন্ধুমার কান্ড। কিন্তু সত্যি বলছি, সেদিন কিন্তু আমরা ভাল ছেলেমেয়ের মতই পড়ছিলাম। একটা পাখি যদি এসে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে আমাদের কী দোষ? কী করব আমরা? পাখি তো ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে, বেরোনোর পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমরা পাখিকে ধরার জন্য মত্ত হয়ে উঠলাম। এমন একটা পাখি ধরার সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায় বলত! যে চউকিতে বসে এতক্ষণ পড়ছিলাম আমরা, সেই চউকির ওপরেই উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে পাখি ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম তিনজনে, প্রায় ধরে ফেলেওছিলাম একবার। কিন্তু পাখি যেই 'হাঁ' করল বাপরে বাপ কী ভয় পেয়ে গেলাম আমরা। পাখিকে ধরা তো দূরের কথা লাফালাফি ঝাপাঝাপিই সার হল। মাঝখান থেকে ঘটনাটা দাঁড়াল এই রকম। মা টের পেয়ে গেল। লাঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তখন ঘরের চিত্রটা এইরকম, ভাই এক দরজার আড়ালে, দিদি আর এক দরজার আড়ালে, আমি চউকির ওপর, মার চোখের সামনে। মা আমাকে টার্গেট করে এগিয়ে এল, দিদি আর ভাই সেই সুযোগে ঘরের বাইরে পালাল। পাখি তো তার আগেই পালিয়েছে। ব্যাস আমার পিঠের অবস্থা আর কী বলব। আমার পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর জন্যে এগুলোই বোধহয় পরোক্ষ সাহায্য করেছিল, বুঝিনি তখন। এখন বুঝি।

একটা গল্প বলে শেষ করি। আমাদের বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ছিল। কিন্তু ছোটদের সেখানে যাওয়া নিষেধ না থাকলেও প্রয়োজনীয়তার কথা কারুর মাথাতেও আসত না। বাড়ির বাচ্চারা আবার ওখানে যাবে কী! সে আবার হয় নাকি! ফলে আমাদের পায়খানা করতে হলে মাঠেই যেতে হত। এমনকি রাতে পেলেও। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। বেশ অনেকটা রাত হয়েছে তখন। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক। দিদির সেদিন কোনও কারণে একটু ভয় ভয় লাগছিল। হয়ত বেশি রাত বলেই। ও আমাকে বলল, চল তো আমার সঙ্গে। আমি আর দিদি হ্যারিকেন নিয়ে মাঠে গেলাম। কাজকম্ম সারা হল। এবার ফিরছি। হ্যারিকেনের আলো টর্চ লাইটের মত হত না। ফোকাস পড়ত না। ফলে ঠিক পায়ের সামনেটা ঠিকঠাক দেখা যেত না। রাস্তা দিয়ে দিব্বি আসছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার ওপর ইয়া মোটা আর ইয়া লম্বা কালো একটা সাপ শুয়ে আছে। অরেব্বাবারে! আমি আর দিদি চিৎকার শুরু করলাম পরিত্রাহি। আমি করলাম কি, এক লাফে দিদির কোমর জড়িয়ে ঝুলে পড়লাম। দিদি যে হাঁটতে পারবে না সে খেয়াল নেই। দিদি লেংড়ে লেংড়ে চলার চেষ্টা করতে লাগল। সাপ কিন্তু ততক্ষণে ত্রিসীমানায় নেই। আমাদের লাফালাফির চোটেই হোক কিংবা চিৎকারেই হোক সে আর এ তল্লাটে নেই। কিন্তু আমরা দুজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েই যাচ্ছি। মাঝখান থেকে আশেপাশের বাড়ির সব লোক জেগে গিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল এই ভেবে যে, ডাকাত পড়েছে বুঝি। ওই সময় ডাকাতি হত খুব। এক দল লোক চলে এল আমাদের চিৎকার শুনে। আমরা তখন লজ্জায় মরি। ছি ছি। এতটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। দিদির কোমর ছেড়ে নামলাম নীচে। তারপর দে ছুট। কী যে কান্ড ঘটিয়েছিলাম সেদিন কী আর বলব! এখন এসব বলতে গিয়ে চোখের সামনে সেই দিনগুলো জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

এখন এই বড়বেলায়, নানান কাজে এখানে ওখানে যেতেই হয়, যেখানেই যাই না কেন, বেশিদিন আমার ডুয়ার্স ছেড়ে থাকতে পারি না। কোথাও আমি আমার নিজের জায়গার মত পূর্ণিমা আর অমাবস্যার রূপ দেখি নি। কোত্থাও না। কোথাও এমন সবুজ পাই না। আমি তীর্থস্থানে বেড়াতে একটু বেশি ভালবাসি। একটা মজার কথা বলি, একথা আমি অনেককেই বলি, বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়ে দেখি কী রুক্ষ আর কী ধুলো রে বাবা! গাছপালা নেই, খটখটে একটা জায়গা। আমি ভেবেই পাই না রাধা-কৃষ্ণর প্রেমটা এখানে হল কী করে! এমন কাঠখোট্টা জায়গায় কি প্রেম হয়! তাহলে ওঁরা আমাদের ডুয়ার্সে এলে কী হত ভাব একবার। এখানে তো এমনিতেই প্রেম ভরে আছে সব জায়গায়! হা হা হা...

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

রবি এসেছিল শালগুড়িতে মুদির দোকানে কাজ করতে। নিখোঁজ হল। লাশ পাওয়া গেল কয়েকদিন পর। কে মেরেছিল রবিকে? নিতান্ত কৌতূহল বশতঃ খোঁজ করতে গিয়ে নন্দন বর্মা একটা অনুমান খাড়া করলেন। সেটা শুনে ঘাবড়ে গেলেন সন্দীপ জানা। মুদির দোকানের মালিক রাধু বর্মনের ছেলের বউ রিয়া। সন্দীপ জানার বন্ধু সে। রিয়া কি খুনিকে জানে? নাকি নন্দন বর্মার অনুমানে কোথাও ভুল হচ্ছে। এবার শেষ পর্বে রহস্যের পর্দা শেষ অবধি উঠল। কিন্তু রহস্যের সমাধান হল কি? নাকি, রহস্যের সমাধান গোপন থাকাই ভালো?

২৫

সন্দীপ জানা স্কুল থেকে বেরিয়ে বাইকে চাপার আগে লুকিং গ্লাসে নিজের মুখ দেখে চুল টুল ঠিক করছিলেন। ইদানিং তাঁকে একটু ফর্সা দেখাচ্ছে কি? বনানীর পরামর্শে অন লাইনে একটা ক্রিম আনিয়ে সপ্তাহ খানেক হল দু-বেলা মুখে মাখছেন। এতে রঙ ফর্সা হয়ে ত্বকে জেল্লা আসার কথা। সেটা এসেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য কলিগরা কেউ কেউ বলছে যে তাঁকে বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে আজকাল।

মুখের রঙ নিয়ে একটু কনফিডেন্স অর্জন করার পর সন্দীপ জানা বাইক ছোটালেন। হায়ার সেকেন্ডারি শুরু হয়েছে। ডিউটি শেষ খাতা বুঝিয়ে স্কুল থেকে বাইরে এসে ভেবেছিলেন ঘরে ফিরে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। বনানীর সঙ্গে রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত ভাব বিনিময় চলছে আজকাল। ফলে ঘুমের ঘাটতি হচ্ছে। বনানীকে দু-বেলা নিজের মুখের ক্লোজ আপ তুলে পাঠাতে হচ্ছে। বনানীর গভীর বিশ্বাস যে ক্রিম কাজ করছে। সন্দীপ জানা অবশ্য গত রাতের শেষ বার্তায় প্রেমিকাকে লিখেছিলেন, ক্রিম উইল ওয়ার্ক। বনানী 'ক্রিম' শব্দের কোন অশিষ্ট মানে না জানায় সরল ভাবে জবাব দিয়েছিল, সিওর। সেটা পড়ে খুব হেসেছিলেন সন্দীপ জানা।

বাইক চালাতে চালাতে সেই হাসিটাই আবার তাঁর মুখে একবার খেলে গেল। তারপরেই কাউকে দেখে থতমত খেয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে বোকার মত হেসে বললেন, 'আপনি?'

রিয়া ছাতা মাথায় হেঁটে আসছিল। হাতে একটা ছিমছাম ব্যাগ। সন্দীপ জানার গোবেচারা ভঙ্গি দেখে তাঁর মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। শান্ত ভাবে তাকিয়ে শুধু বলল, 'হাসতে হাসতে বাইক চালাচ্ছিলেন। লোকে তো পাগল বলবে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' সন্দীপ জানা বাইক দাঁড় করিয়ে ধাতস্থ হয়। 'আসলে আপনাকে তো শালগুড়ির রাস্তায় খুব একটা হাঁটতে দেখি না।'

'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'ঘরে ঢুকব ভাবছিলাম।'

'চলুন।'

'অ্যাঁ!'

'আপনার সঙ্গে আপনার ঘরে যাব। কথা আছে।'

'বা-বাইকে বসবেন?'

'মেয়েদের ক্যারি করার অভ্যেস নেই আপনার?'

'না না। মানে আপনি পেছনে বসলে ---'

রিয়া এতক্ষণে হাসল। 'কেউ কিছু মনে করবে না সন্দীপবাবু! সবাই জানে আপনি আমার বন্ধু। এই মুহূর্তে আপনাকে বন্ধুর দাবি মানতে হবে। আমার সিরিয়াসলি কিছু বলার আছে। চলুন।'

সন্দীপ জানা কয়েক পলক রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বাইক স্টার্ট করল। রিয়ার মুখে আজ যেন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসটা একটু কম পড়েছে। তাঁর হাসি, চোখের ঝলকানি লক্ষ্য করার পরও সন্দীপ জানার মনে হলো, রিয়া যেন বিষণ্ণ। অবশ্য রিয়ার মত নারী বিষণ্ণ হলে কেমন জানি অন্যরকম সুন্দর হয়ে যায়।

সন্দীপ জানা খুব সাবধানে বাইক চ্যালিয়ে নিজের বাসস্থান পর্যন্ত এল। রিয়া খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কাঁধে হাত রেখে গোটা রাস্তাটা এসেছে। রাস্তায় লোকজনও খুব একটা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেনি তাঁদের দিকে। মনোজবাবুর দু-একটা চামচা খালি হাসিমুখে 'বৌদি' ডেকে হাত নেড়েছিল।

ইদানিং নিজের ঘর পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখছিলেন সন্দীপ জানা। রিয়া ঘরে ঢুকে চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, 'বাঃ! আপনার সত্যিই উন্নতি হয়েছে।'

'হেঁ হেঁ হেঁ। চাইলে চা-কফিও পাবেন।'

'থাক।' রিয়া হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে আরাম করে বসল। তারপর মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল কিছু একটা। সন্দীপ জানা স্থির চোখে দেখছিলেন রিয়াকে। তাঁর মনে হল কিছু একটা বলবে

বলে মনে মনে সেটা গুছিয়ে নিচ্ছে রিয়া।

'আপনাকে নন্দনবাবু কিছু বলেছেন?' রিয়া হঠাৎ সোজা হয়ে মাথা তুলে সরাসরি তাকাল। সন্দীপ জানা একটু চমকে গিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপারে?'

'প্লিজ! ভান করবেন না! আপনি জানেন আমি কী জানতে চাইছি?'

সন্দীপ জানা জবাব না দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে জলের বোতলটা খুঁজে বের করলেন। কয়েক ঢোঁক খাওয়ার পর তাঁকে একটু শান্ত দেখাল। একটা মোড়া টেনে নিয়ে রিয়ার মুখোমুখি বসে বললেন, 'নন্দন বর্মার কথায় লজিক আছে। আমারও মনে হয় রবিকে আপনাদের বাগানেই মার্ডার করা হয়েছে।'

'নন্দনবাবুর যুক্তি ছাড়ুন! আপনার কী মনে হয়? রবিকে মার্ডার করা হল, লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হল আর আমরা কিছু টের পেলাম না?'

'কী করে টের পাবেন? রবি তো মাঝেই মাঝেই বাগানের দিকে যেত। আচ্ছা, রবি যে বাগান থেকে বেরিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল সেটা কি দেখেছিলেন আপনারা?'

'ঘরের ভেতরে থাকলে সেটাও সম্ভব না।'

'তবেই ভাবুন রবি যে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল, তারও কোন প্রমাণ নেই।' সন্দীপ জানা কথাটা বলে বেশ তৃপ্তি পেলেন। রিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে অন্য দিকে চেয়ে আছে। সন্দীপ জানার মনে হল, রিয়া চাপে আছে। কিন্তু চাপের কারণটা বোঝা যাচ্ছে না? রিয়া কি কিছু গোপন করছে?

'আপনি কি কিছু লুকোচ্ছেন?' প্রশ্নটা মাথায় আসা মাত্র সন্দীপ জানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রিয়ার চোখে মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে একটু ক্লান্ত চোখে সন্দীপ জানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী লুকোতে পারি বলে আপনার মনে হয়?'

'তবে এত চাপ নিচ্ছেন কেন? নন্দনবাবু পুলিশ নন। তিনি নিজে একটা ব্যাখ্যা ভেবেছেন। বাগানের কোনায় যে স্টোরেজটা আছে, সেখানে অবশ্য ঘি-এর টিন দেখেছি আমরা।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'কিস্যু না! তবে, কিছু মনে করবেন না আপনি খামোকা চাপ নিচ্ছেন কেন সেটা বলবেন? রবির যা-ই হক, সে যেভাবেই খুন হক তাতে আপনার কোন রেসপন্সিবিলিটি আছে?'

রিয়া স্থির চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল সন্দীপ জানার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আছে কি না সেটা নন্দনবাবুকে একবার জিগ্যেস করে দেখবেন?'

'আপনি নিজে কথা বলছেন না কেন?'

'থ্যাঙ্কিউ ফর অ্যাডভাইজ। বলব।'

রিয়া ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সন্দীপ জানার মাথা কিঞ্চিৎ ভোঁ ভোঁ করছিল। রিয়া চাপে, তার মানে সে কিছু জানে! সে কিছু লুকোচ্ছে! তাহলে কি রবির মার্ডার হওয়া সে দেখে ফেলেছিল? মার্ডারার কি তাঁর চেনা? কে সে? মনোজবাবু নয় তো?

কিন্তু নানা দিক থেকে অনেক ভেবেও কিছুতেই মনোজবাবুকে খুনির তালিকায় ফেলতে পারল না সন্দীপ জানা। মনোজবাবু সে সময় বাড়িতে ছিলেন না। অকাট্য প্রমাণ আছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সন্দীপ জানা ঠিক করে ফেললেন যে তিনি নিজেই দেখা করবেন নন্দন বর্মার সঙ্গে। তিনি শালগুড়িতেই আছেন।

২৬

ঝাঝাঙ্গি ধাবার একটা কোনায় বসে দু- প্লেট রাবড়ির অর্ডার দিয়ে নন্দন বর্মা একটু হেসে বললেন, 'সুগারের প্রবলেম নেই তো?'

'নো স্যার!' উল্টো দিকে বসে থাকা সন্দীপ জানা স্মার্ট হলেন। শালগুড়ির বদলে আজ সকাল ন-টায় ঝাঝাঙ্গি ধাবায় দেখা করার জন্য নন্দন বর্মার এসেমেস পেয়ে একটু চমকেছিলেন তিনি। দেখা করতে চেয়ে প্রথমে সন্দীপ জানাই এসেমেস করেছিলেন দু-দিন আগে। জবাব এসেছিল কাল রাতে। স্কুলে সেকেন্ড হাফে ডিউটি বদলে তিনি সাড়ে আটটার মধ্যে ধাবায় হাজির হয়েছিলেন প্রবল কৌতুহল নিয়ে। নন্দন বর্মা অবশ্যি হাজির হন ঠিক ন-টা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে।

'বলুন, দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন?'

নন্দন বর্মার প্রশ্নে একটু নড়েচড়ে বসলেন সন্দীপ জানা। 'আপনি সেদিন মনোজবাবুদের চা বাগানে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন, সেটা আমার সত্যি মনে হচ্ছে।'

'আমি পুলিশ নই। নিতান্ত কৌতূহলি হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম।'

'আপনি পুলিশকে কিছু জানাবেন না?'

'রাধু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে ওকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

সন্দীপ জানা মনে মনে স্বস্তি পেলেন। রাবড়ি চলে এসেছে। একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে নন্দন বর্মা বললেন, 'খান। জিনিসটা এরা ভালো বানায়।'

'আপনার অনুমানটা একবার খুলে বলবেন? আপনি কি জানেন ঠিক কী হয়েছিল?'

'ঠিক কী হয়েছিল সেটা ও বাড়ির লোকই বলতে পারবে।'

'ও বাড়ির লোক বলতে?'

'রবিকে শেষ কে দেখেছিল?'

'রিয়া আর গুবলি।'

'ও বাড়ির সঙ্গে আপনার ভালো যোগাযোগ। হয় তো জানবেন কোনদিন।'

সন্দীপ জানা চুপচাপ রাবড়ি খেতে লাগলেন। স্বাদটা চমৎকার। তাঁর খাওয়া একটু সময় ধরে দেখলেন নন্দন বর্মা। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি কি এটুকু জানার জন্যই আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন?'

'না।' একটু জল খেয়ে মুখ মুছলেন সন্দীপ জানা। 'আসলে রিয়াকে খুব টেন্সড দেখছি। আমার মনে হয় সে জানে।'

'কী জানে?'

'খুনটা কে করেছে। আমার মনে হয় খুনিকে রিয়া চেনে। নয় তো এত টেনশনের কারণ কী? আপনার ব্যাখ্যা শুনে সে খুব আপসেট হয়ে পড়েছে আমাকে বলছে না, বাট আই ফিল স্যার। রিয়া হ্যাজ বিন চেইঞ্জড্।'

'আর ইউ গুড ফ্রেন্ড অফ হার?'

'ইয়েস স্যার। শি ইজ ভেরি নাইস!'

নন্দন বর্মা কয়েক চামচ রাবড়ি খেলেন। সন্দীপ জানা অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কিছু শোনার জন্য। নন্দন বর্মা ধীরে সুস্থে প্লেট ফাঁকা করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে শান্ত গলায় বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে রিয়া খুনিকে চেনে। রবিকে খুন করার পর থেকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সবটাই সে জানে। শুধু রিয়া নয়, হয় তো গুবলিও জানে।'

'রিয়া এমন করবে কেন স্যার? রবির খুনিকে আড়াল করবে কেন? সে কে হতে পারে?'

'আরেক প্লেট রাবড়ি খান।'

'তা স্যার খাব। কিন্তু আপনি কিছু লুকোবেন না প্লিজ! রবির খুনিকে আড়াল করে রিয়ার কী লাভ?'

'হয় তো রবির মরে যাওয়াটা রিয়ার পক্ষে ভালো হয়েছিল।'

সন্দীপ জানা এমন একটা কথার জন্য তৈরি ছিলেন না। তিনি কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন। দু-হাতের তালু দিয়ে মুখটা একবার মুছে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আপনার কথা থেকে একটাই অর্থ দাঁড়াচ্ছে স্যার, রিয়া আসলে রবিকে চিনত।'

'প্রত্যেকটা লজিকের একটা আশ্রয় থাকে। আমার যাবতীয় অনুমানের প্রধান আশ্রয় বাক্য হল, ওরা দু-জন পূর্বপরিচিত। আর সেটাই ছিল রবির শালগুড়িতে আসার সূত্র।'

'কী করে সম্ভব স্যার?'

'বী লজিক্যাল। আপনি একজন টিচার। আবেগ আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, কিন্তু সত্য খুঁজতে চাইলে যুক্তি ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই সন্দীপ বাবু! ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন— রিয়ার বাপের বাড়ি আর রবির গ্রাম থেকে মাথাভাঙ্গা শহর প্রায় সমান দূরত্বে। বিভিন্ন কারণে রিয়াকে মাথাভাঙ্গা যেতে হত। দু-জনের বয়সের ব্যবধান তেমন নয় বলেই আমার ধারনা। এ ক্ষেত্রে দু-জনের পরিচয় থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। ইনফ্যাক্ট, রবির মধ্যে একটা কিছু ছিল যা মেয়েদের আকৃষ্ট করত। রবির শালগুড়িতে আসা সেই পরিচয়ের সূত্রেই সম্ভব।'

'কেন এল? ব্ল্যাকমেইল?' সন্দীপ জানা সোজা হয়ে বসেন। কিন্তু নন্দন বর্মা আর কিছু বললেন না। রাবড়ির নতুন প্লেটটা টেনে নিয়ে মন দিয়ে খেতে লাগলেন।

'আপনি কিছু বলছেন না যে?'

'আমি আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে রাজস্থান। হয় তো পুজোর আগে আর শালগুড়ি ফিরব না। আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট —এ নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। রিয়াকে আমি একটা চিঠি লিখেছি। সেটা পৌঁছে দিলে খুশি হব।'

'কী লিখেছেন?'

'সেটা জানার দরকার নেই।'

'আমি তাঁকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলাম।'

'সে যোগাযোগ করে নি। বাই দ্য ওয়ে— চিঠিটা কি আপনি পৌঁছে দেবেন?'

'সিওর স্যার।'

'গাড়িতে আছে। যাওয়ার সময় দিচ্ছি।'

'রিয়া কি স্যার মার্ডারার?'

নন্দন বর্মা মলিন হাসলেন। 'খুন সে করে নি। কিন্তু খুনটা হওয়ায় সে দুঃখিতও নয় মিস্টার জানা! আপনি ক-দিন পর নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন। সে সব নিয়ে ভাবুন।'

'ঠিকই বলেছেন স্যার। তবে আমাকে না পেলে চিঠিটা কী ভাবে দিতেন স্যার?'

নন্দন বর্মা হাসলেন। রাবড়ি খেয়ে বললেন, 'ঠিক জানি না। মেইল করতে পারতাম। রিয়া যথেষ্ট টেক স্যাভি। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে চিঠিটার খবর আর কেউ জানবে না— দরকারে কয়েক দিন পরে দেবেন।'

'ওকে স্যার!'

'রাবড়ি খান।'

২৭

চিঠিটা সংক্ষিপ্ত। রিয়া যখন খামটা খুলল, তখন গভীর রাত। বাড়ির সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বসার ঘরে এসে রিয়া চিঠিটা পড়ল—

স্নেহের রিয়া

আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। তুমি কি রবিকে চিনতে? তুমি কি রবির খুনিকে চেন? গোপন না করে আমাকে লিখে জানাতে পার। কেউ জানবে না কারণ আমি তোমাদের পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষি। তোমার শ্বশুর আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু আমাকে জানালে তুমি মনের দিক থেকে হালকা হতে পার। ঠিকানা রইল। আমি কিছু অনুমান করেছি। সেটা একবার মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। ইতি।

রিয়া কয়েক বার পড়ল। হ্যাঁ। কোথাও নিজেকে উজার করে দেওয়া দরকার। নচেৎ এই ভার সে আর বইতে পারছে না।

২৮

শ্রদ্ধেয় নন্দনবাবু,

আপনার চিঠি পাওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সত্যিটা অনুমান করতে পেরেছেন। মনোজ আমাকে বলেছিল, ঘি দিয়ে আবর্জন পোড়ানর কথাটা। হাসতে হাসতে বলেছিল। সেদিন আমি গোটা রাত ঘুমোই নি। বুঝতে পেরেছিলাম, ধরা পড়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ। রবিকে আমি চিনতাম। ওর খুনিকেও আমি চিনি। রবিকে কেন চিনতাম সেটা আগে বলি।

আমার বাবার প্রাইমারি স্কুলের টিচার হলেও আমাদের পরিবার বেশ স্বচ্ছল। বাবার অনেক জমিজমা আছে। আমি ছোটবেলা থেকেই আধুনিক যন্ত্রপাতি পছন্দ করতাম। আমাদের গ্রামে আমাদের চেয়ে বড়লোক পরিবার আছে, কিন্তু প্রথম আমাদের বাড়িতেই ফ্রিজ এসেছিল। ডিশ অ্যান্টেনা সমেত টিভি, রিমোটে চলা সিলিঙ ফ্যান, বিএসএনএল-এর ল্যান্ড লাইন সমেত ইন্টার নেট— এসব গ্রামের মানুষ প্রথম বুঝেছিল আমাদের দেখে। এসব হয়েছিল আমারই উৎসাহে। ক্লাস এইটে পড়ার সময় কম্পিউটর কিনে দেয় বাবা। সেটা দেখার জন্য আমার ক্লাসের সবাই কয়েকবার করে এসেছে আমাদের বাড়ি। এমন কি টিচারও।

কিন্তু কম্পিউটর আমি তেমন ভালো অপারেট করতে পারতাম না। ইন্টারনেট শিখতে মাথাভাঙ্গায় যেতাম মাসে দু-দিন। কিন্তু বিশেষ কিছু সিখতে পারি নি। ক্লাস নাইনে উঠলাম যখন, তখন মোবাইল ফোনের হাওয়া এল। আমি পাগল হয়ে গেলাম। বাবা খরচা করে ফোন কিনে দিতে কার্পণ্য করে নি। কিন্তু সেটা ঠিকমত অপারেট করার কে শেখাবে?

তখনই রবির সঙ্গে আমার আলাপ।

তখন সদ্য নাইনের বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমার কম্পিউটরটা ঠিক মত চলছিল না। খুব স্লো হয়ে গেছিল। মেশিনটাকে ফরম্যাট করার জন্য আমি মাথাভাঙ্গায় যোগাযোগ করলাম। কিন্তু দোকান থেকে বলল, যেতে পারবে না। সিপিইউ পাঠিয়ে দিতে। আমি সেটা চাইছিলাম না। আমি কোথাও শুনেছিলাম যে, সিপিইউ পার্টস গোপনে বদলে দিতে পারে। কম দামি হার্ডওয়ার লাগিয়ে ফেরৎ পাঠাতে পারে।

তখন কেউ একজন আমাকে বলেছিল রবির কথা। একটা ছেলে আছে। সে কম্পিউটর-মোবাইলের কাজ দারুন জানে। বাড়িতে এসেই কাজ করে দিয়ে যাবে। আমি কোন কিছু চিন্তা না করে সেই ছেলেটাকে খবর পাঠাতে বলেছিলাম। আসলে পরীক্ষার পর যে কয়েক দিন ছুটি পাওয়া গেছিল, সে সময়টা কম্পিউটর ছাড়া চলছিল না। কয়েকটা সিনেমা লোড করে রেখেছিলাম কয়েকজন বান্ধবী মিলে একসঙ্গে দেখব বলে। মেশিন ঠিক না হলে সে সব কিছুই মাঠে মারা যেত।

রবি এসেছিল দুপুর বেলায়। আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। মাথাভাঙ্গায় যে সেন্টারে ইন্টারনেট শিখতে যেতাম, সেখানে দু-একদিন দেখেছি। আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গে গল্প করত। সাধারণ চেহারা। তবে বেশ ফিটফাট। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। কয়েক ঘন্টা ছিল সেদিন। প্রথমে কম্পিউটরটাকে ফর্ম্যাটিং-এ বসিয়ে আমার মোবাইলটা নিয়ে পড়ল। ফোনটাতেও সমস্যা হচ্ছিল কিছু। রবির হাতে সেটা দশ-পনের মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে গেল। আমি মুগ্ধ হতে শুরু করলাম।

রিয়া ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সন্দীপ জানার মাথা কিঞ্চিৎ ভোঁ ভোঁ করছিল। রিয়া চাপে, তার মানে সে কিছু জানে! সে কিছু লুকোচ্ছে! তাহলে কি রবির মার্ডার হওয়া সে দেখে ফেলেছিল? মার্ডারার কি তাঁর চেনা? কে সে? মনোজবাবু নয় তো? কিন্তু নানা দিক থেকে অনেক ভেবেও কিছুতেই মনোজবাবুকে খুনির তালিকায় ফেলতে পারল না সন্দীপ জানা।

বিকেলের দিকে রবি যখন গেল তখন আমার কম্পিউটর নতুনের মতই দৌড়োচ্ছে। ইন্টারেনেটের কনফিগারেশনে নাকি গোলমাল ছিল। সব কিছুই ঠিক করে দিল রবি। আমি দেখলাম যন্ত্রপাতি বিষয়ে রবির একটা আলাদা ভালবাসা আছে। আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকা আরেকটি গ্রামের ছেলে যে কম্পিউটর মোবাইলের কাজ এত ভাল জানে— সেটা আমিই ভাবতেই পারি নি। বিকেলের রবি যখন চলে গেল তখন আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

সেটা আমার প্রথম প্রেম। আমরা দু-জনে প্রায় বছর দেড়েক ভেসে গিয়েছিলাম সেই প্রেমে। অবশ্য দু-জন বললে ভুল হবে। আমিই ভেসেছিলাম। রবি ছিল আমার কাছে নায়ক। সে অবশ্য তাঁর পরিচয় কিছুই লুকোয় নি। সে আমাকে কম্পিউটর-মোবাইলের নানান কায়দা শেখাত। আমি স্বপ্ন দেখতাম যে রবি কম্পিউটরের ব্যবসা করবে, মোবাইলের দোকান দেবে। তার জন্য অবশ্য অনেক টাকার দরকার ছিল। আমি হিসেব করতাম যে আমার গয়নাগুলো বিক্রি করে সেই টাকার কতটা আসবে।

আপনাকে বলতে লজ্জা নেই— আমি আর রবি গোপনে কয়েকবার মিলিত হয়েছিলাম। রবি অবশ্য সে ক্ষেত্রে সব রকম প্রোটেকশন নিত বলে সমস্যায় পড়তে হয় নি।

এইভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল। ইলেভেনে ভর্তি হওয়ার ক-দিন পর হঠাৎ জানলাম, রবি শর্বরীর সঙ্গে প্রেম করছে। শর্বরী আমার ক্লাস মেট। আমি অবাক হয়ে রবিকে ফোন করলাম। রবি স্বীকার করল।

প্রেম ভেঙে গেল আমার। এরপর সেই শূন্যতা আর অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। তারপর মেনে নিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, আর কোনওদিন প্রেম করব না। বাড়ি থেকে যার সঙ্গে ঠিক করবে, তাঁকেই বিয়ে করব।

এরপর সময় কেটে গেছে। আমার বিয়ের তোড়জোড় শুরু হল। পাত্রী হিসেবে আমি খারাপ ছিলাম না। সম্বন্ধের বন্যা বয়ে গেল। সবাই ভালো ছেলে। কিন্তু সবার 'ডিমান্ড' চাই। আমাদের সমাজে পণকে 'ডিমান্ড' বলে, সে নিশ্চই আপনার অজানা নয়। কিন্তু আমি বলেছিলাম, কোন পণ দেবে না আমার বাবা। বিনা পণে বিয়ে করতে চাইলে ভাবব।

তখন হঠাৎ আপনার বন্ধুর পরিবার থেকে সম্বন্ধ এল। আপনার বন্ধু একদিন আমাকে দেখে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'এমন মেয়েকে ছেলের বউ করতে পারলে খুশি হব। টাকা পয়সার কোনও ব্যাপারই নেই।'

কথাটা আমার মনে ধরেছিল। বিয়েটা করে ভুল করি নি। গোটা সংসারটাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমার শ্বশুর। আমি সে সংসার নিজের মত করে সাজিয়েছি। ওদের টাকা পয়সার অভাব তেমন নেই। কিন্তু খরচ করত খারাপ ভাবে। মনোজ এমনিতে খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর একমাত্র ইচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া। সব চাইতে বড় কথা, আমার শিক্ষা-দীক্ষা-রুচিকে সে খুব সম্মান করে। মোবাইল চালাতে সমস্যা হলে নির্দ্বিধায় আমার কাছ থেকে বুঝে নেয়। এ নিয়ে তাঁর কোন ইগো নেই।

মোট কথা বিয়ে করে আমি বেশ সুখি হলাম। আমি চাকরি বাকরি করতে চাইনি। আমার দিদিমা আঁচলে একগুচ্ছ চাবি বেঁধে দাপিয়ে সংসার করত। আমি তেমনটা হতে চেয়েছিলাম।

রবির কোন অবশেষ আমার মধ্যে আর ছিল না। আমি তাঁর খবর জানবারও কোন চেষ্টা করি নি। দিন বেশ চলছিল।

তারপর একদিন রবি ফিরে এল।

আমি জানতাম না রবি আমাদের দোকানে কাজ নিয়েছে। মনোজকে তখন মোবাইলে ফোটো তোলায় পেয়েছে। কিন্তু ছবিগুলো দেখতে পারত না তোলার পর। নতুন মোবাইল নিয়ে সে তখন খাবি খাচ্ছে। রাতে বাড়িতে এসে আমাকে ফোনটা দিত। আমি সব অর্গানাইজ করে দিতাম। একদিন ওর তোলা ছবিগুলো দেখতে দেখতে প্রচন্ড অবাক হয়ে দেখলাম রবি! চিনতে কোনও ভুল হয় নি আমার। মনোজকে বললাম, ও কে? সে নির্বিকার ভাবে জানাল, দোকানে নতুন জয়েন করেছে। তিন চারেক হল।

এরপর কয়েক দিন ভালো করে ঘুমোতে পারি নি। রবি আমাদের দোকানে কাজ নিয়েছে! এটা অবিশ্বাস্য! সে আমার জন্যই এসেছে! সে কি ব্ল্যাকমেইল করবে আমাকে?

আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম প্রথমে। বিয়ে করে

অনেক সুখে আছি কাকাবাবু! এটা আমি হারাতে চাই না।

তারপর একদিন রবির সঙ্গে দেখা হল। দোকানের মাল নিতে এসেছিল। বাড়িতে স্টক আমিই সামলাই। সে খুব স্বাভাবিক আচরণ করল। আমাকে বলল, বিয়েটা না হয়ে দু-জনেরই ভাল হয়েছে। তারপর সরাসরি বলল, টাকা লাগবে। সে ব্যবসায় নামবে। টাকা চাই। টাকা পেলেই চলে যাবে সে।

আমি কিছু না ভেবে বলেছিলাম, পঞ্চাশ হাজার দেব। কিন্তু একবারে নয়। রবি রাজি হল। বলল, যেদিন পঞ্চাশ হাজার পুরো হবে, তার পরের দিনই চলে যাবে। আর কোনওদিন আসবে না।

দিন কাটতে লাগল। আমি টাকা দিতে শুরু করলাম একটু একটু করে। পরিস্থিতি একটু সহজ হয়ে এল। আমি বুঝতে পারলাম যে রবি আমার চোখে অনেকটা পড়ে গেছে। মালপত্র নিতে সে প্রায়ই আসত। কিন্তু কথাবার্তা হত না। শ্বশুরের মুখে ওর প্রশংসা শুনতাম। তারপর একদিন গুবলি অদ্ভুতভাবে সেজেগুজে আমার ঘরে ঢুকল।

গুবলিকে আপনি দেখেছেন। সে শ্বশুরের ভাইদের ঘরের মেয়ে। চা বাগানের ও পাশটায় ওদের বিরাট জায়গা নিয়ে বাড়ি। গুবলি খুব সরল মেয়ে। বুদ্ধি কম। কিন্তু ভগবান ওর শরীরে যৌবন ঢেলে দিয়েছে। আমার সঙ্গে গুবলির খুব ভাব। গুবলি কাকিমা বলতে অজ্ঞান। কিন্তু গুবলি খুব সাধারণ ভাবে থাকত। মেয়েরা একটু সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু গুবলির সে সব বালাই ছিল না। সেই গুবলি একদিন আমার ঘরে এল অদ্ভুত ভাবে সেজেগুজে। আমি দেখলাম, মুখে প্রচুর পাউডার মেখেছে। নতুন নাইটি পরেছে। হাতে কয়েকটা কাচের চুড়ি, কপালে টিপ আর বোধহয় আধা বোতল পারফিউম ঢেলেছে শরীরে।

আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, এত সেজেছে কেন! সে বলল, তাঁর আর রবির প্রেম হয়েছে।

শুনে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। কিন্তু গুবলিকে বোঝান অসম্ভব। কী করে বোঝাব? জানলাম, সে আর রবি চা বাগানে লুকিয়ে দেখা করে, কথা বলে। গুবলির অভিভাবকদের জানালে মেয়েটা মার খেয়ে মরেই যেত বোধহয়। রবিও রেহাই পেত না। রবি কি তখন সব ফাঁস করে দিত না?

বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকলাম। ওদের প্রেম চলতে লাগল চা বাগানে। কিন্তু ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করে নি। সুযোগ পেলেই গুবলি আমাকে সবিস্তারে শোনাত তাঁর রবির কথা। সে তখন প্রেমে অন্ধ। প্রথম প্রেমের শুরুতে যেমন হয়। যেমন আমারও হয়েছিল। এই অবস্থায় আমার কিছু করার ছিল না। আমি চেষ্টা করছিলাম টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পারি যোগার করে রবিকে শালগুড়ি ছাড়াতে। কিন্তু এটাও ভাবছিলাম যে রবি টাকা পেলে শালগুড়ি থেকে সত্যিই চলে যাবে কি না।

তারপর একদিন থমথমে মুখে গুবলি এল। বলল, রবির সঙ্গে বনানীর প্রেম হয়েছে। সে দু-জনকে দেখেছে একসঙ্গে। এবার আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, রবি ভালো ছেলে না। সে খুব খারাপ। গুবলি কিছু বলে নি। সে কয়েকদিন গুম হয়ে ছিল। শেষে একদিন আমাকে বলল, সে প্রেগনেন্ট।

আমার মাথায় বাজ পড়ল। প্রেগন্যান্সি টেস্টিং কিট আনিয়ে আমি ওর ইউরিন পরীক্ষা করলাম তিন বার। প্রতিবারই নেগেটিভ। কিন্তু গুবলির পিরিয়ড সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ওকে বোঝালাম যে সে গর্ভবতী হয় নি। কিন্তু সে বোঝে নি। এরপর তাঁর মধ্যে প্রচন্ড ভয় ঢুকল। চারদিকে ছায়া ছায়া লোকের যাওয়া আসা দেখতে পারছিল। এই অবস্থায় ভৃগু জ্যোতিষ বাঁচালেন। আমি তাঁকে একদিন ফোনে সব বলে ফেললাম। তিনি গুবলিকে একদিনের জন্য নিয়ে যেতে বললেন। নিয়ে গেলাম। উনি কী কী করলেন জানি না, কিন্তু গুবলি স্বাভাবিক হল।

বনানীকে আমি চিনতাম। শালগুড়ির মেয়ে হলেও সে ছিল প্রথমে আমার ফেসবুক বন্ধু। তারপর আলাপ হল। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত বনানী। বেশ মিষ্টি মেয়ে। বুদ্ধিমতী। আমি তাঁকে ডেকে আনিয়ে জিগ্যেস করলাম রবির কথা। সে খুব লজ্জা পেয়ে বলল, রবির প্রেমে পড়েছে সে। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। রবির মত ছেলে হয় না। আমি তাঁকে কিছু বলি নি। আমার মনে হচ্ছিল, রবি শালগুড়ি ছাড়তে চাইবে না। তাঁর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

কাকাবাবু! সেই সময়ে আমার মনে কী চলছিল তা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমার দম আটকে আসত। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতাম। মাঝে মাঝে ভাবতাম, মনোজকে সব বলে দেব। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না।

কিন্তু সব হঠাৎ মিটে গেল। সেদিন রবিকে দু-টিন ঘি দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে সিনেমা দেখতে বসেছিলাম। রবি বাগানের দিকে গেল। আমি জানলা দিয়ে দেখলাম। এরপর সিনেমায় ডুবে গিয়েছিলাম— আচমকা দেখলাম, গুবলি বাইরের উঠোনে রাখা রবির ভ্যান রিক্সা থেকে ঘিয়ের টিন দুটো নিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক হলেও তখনি কিছু বললাম না। গুবলি একটু পরে ফিরে এসে ভ্যান রিক্সাটাকে গোয়ালঘরের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গরু থাকে না। আমাদের ভ্যান রিক্সাগুলো রাখা থাকে। গুবলি গোয়ালের ওদিক থেকে ফিরে এল একটা প্রায় ভেঙে যাওয়া রিক্সা নিয়ে। আমি দেখলাম সেই রিক্সাটা নিয়ে সে বাগানের দিকে যাচ্ছে।

আমার মনে হয়েছিল সে ঘি-এর টিন আর রিক্সা লুকিয়ে রেখে রবির ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। তাই অতটা গা করি নি। আরও কিছুক্ষণ পর গুবলি সোজা আমার ঘরে ঢুকে খুব শান্তভাবে বলল, রবি মরে গেছে। রবিকে সে মেরে ফেলেছে।

না কাকাবাবু! গুবলির কথা শুনে আমি ভয় পাই নি। ওর সঙ্গে বাগানে কোনায় ভাঙাচোরা জমিয়ে রাখার জায়গাটায় গিয়ে দেখি রবি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। চোখ অল্প খোলা। মাথার পেছন দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে ঘাস ভিজিয়ে দিচ্ছে।

রবিকে গুবলি বাগানে ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করেছিল সে বনানীর প্রেমে পড়েছি কি না। রবি তাঁকে ছুঁয়ে দিব্যি দিয়ে বলতে গেছিল, কথাটা মিথ্যে। গুবলি কিছু বলে নি। সে চাদরের তলায় একটা ছোট শাবল লুকিয়ে রেখেছিল। দু-পা পিছিয়ে সেটা বের করে প্রচন্ড এক আঘাত করে রবির মাথায়। গুবলির শরীরে প্রচন্ড শক্তি। রবি বোধহয় সেই আঘাতেই মরে গেছিল। তবুও সে পড়ে যাওয়ার পর গুবলি একটা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ওর মুখে পেঁচিয়ে ধরে। তারপর যখন বোঝে রবি মরে গেছে, তখন তাঁর দেহটা টেনে ভাঙাচোরা রাখার ঘেরা জমিটায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।

আমি ভয় পাই নি। আমার বরং মনে হল রবির মোবাইলের কথা। মোবাইল লোকেশান থেকে পুলিশ অনেক কিছু জেনে যায়। আমি গুবলিকে বললাম, সবার আগে মোবাইলটা দূরে কোথাও ফেলে আসতে। গুবলি রবির পকেট থেকে ফোনটা বের করে আমাকে বলল ঘরে ফিরে যেতে। যা করার সে একাই করবে। বাগানে যেন কেউ না ঢোকে।

গুবলি ফোনটা নিয়ে একটা সাইকেল যোগার করে চলে গেল। ফিরল প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর। এর মধ্যে বাগানে কেউ যায় নি। আসলে ক-দিন ধরে বাগানে পরিচর্যার কিছু ছিল না। পাতা তোলা হয়েছিল। সকালের দিকে দুটো লেবার একটু দেখে শুনে চলে যেত। গুবলি খুব শান্তভাবে ফিরে এসে বলল, মোবাইলটা সে শিঙ্গিহাটায় সুইচ অফ করে ফেলে দিয়েছে।

রাতে রবির লাশ টেনে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল গুবলি। তারপর স্নান করে আমাদের বাড়িতেই একটা ঘরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল আবার আগের মত হয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল যে হঠাৎ বৃষ্টি নামায় রবির লাশ ভেসে অনেক দূর চলে যায়। পুলিশ যদি গোড়াতে আমাদের বাগানটায় তদন্ত করত, তবে রক্তের দাগ পেত। শাবলটাও পেত। ঘি-এর টিনও। কিন্তু পুলিশ বাগানে আসেই নি। মোবাইল লোকেশান তাঁদের ভুল বুঝিয়েছে। আর আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম যে রবি ঘি নিয়ে চলে গেছিল। গুবলি দেখেছে।

আমাদের অনেকগুলো ভ্যান রিক্সা। গুণতিতে একটাই কম পড়েছিল। সবাই ভেবে নিয়েছিল সেটা রবি নিয়ে গেছে। আপনার অনুমান ঠিক। রিক্সাটা গুবলি দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর একদিন আবর্জনা পোড়াবার অছিলায় সে সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পোড়ানর কাজে ঘি-এর টিন দুটো কাজে লেগেছিল। ঘি দিয়ে ভাল পোড়ান যায়।

এই হল আমার বক্তব্য। এখন আমি নিশ্চিন্ত। গুবলি আমার জীবন আবার সহজ করে দিয়েছে। আমরা কি ধরা পড়ব? না, এখন আর কোনও প্রমাণ নেই। আপনি নিশ্চয়ই এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলবেন।

প্রণাম নেবেন। আপনার ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল। ইতি।

২৯

দু-বার মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন নন্দন বর্মা। লম্বা ভ্রমণ সেরে জলপাইগুড়ি ফিরেছেন আজ দুপুরে। এসেই চিঠিটা পেয়েছেন। কুরিয়ারে এসেছিল। স্নানটান করে ফ্রেশ হয়ে চিঠিটা নিয়ে বসেছিলেন ব্যালকনিতে। এখন চারদিক ভরপুর বসন্ত। মনোরম হাওয়া বইছিল। শীত শীত ভাবটা বেশ আরামদায়ক। দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়ে নন্দন বর্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরে তাকালেন। তাঁর মনে পড়ছিল কলেজের এক অধ্যাপকের কথা। কোনও এক প্রসঙ্গে একবার ক্লাসে তিনি বলেছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশরের কথা।

পঞ্চশর নিক্ষেপ করেন মদনদেব। কিন্তু সব সময় লক্ষ্যভেদ হয় না। লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর নাকি এক ধরনের অভিশাপ। কোনও কোনও নারী কিংবা পুরুষের জীবন এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট মদনবাণে বিদ্ধ হয়। প্রেম তাঁকে নিয়ে মৃত্যুর দিকে যায়। রবি বোধহয় মদনদেবের লক্ষ্যভ্রষ্ট শরেই বিদ্ধ হয়েছিল।

হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নন্দন বর্মা ভেতরে গিয়ে একটা লাইটার নিয়ে এলেন। জোর হাওয়ায় লাইটার জ্বালিয়ে রাখা শক্ত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লাইটারের শিখায় চিঠিটা জ্বালিয়ে দিতে সফল হলেন তিনি। কয়েক পাতার চিঠি কালো হয়ে কুঁকড়ে যেতে সময় নিল এক মিনিটেরও কম।

পরের মিনিটে ছাইগুলো হাওয়ার ধাক্কায় ব্যালকনি থেকে উড়ে কোথায় জানি হারিয়ে গেল।

(সমাপ্ত)

শিলিগুড়ি ডায়েরি

বাংলাভাষার দুই মহারথীকে হারিয়ে দুঃখী শহর এগিয়ে চলেছেন ফুলেশ্বরী নন্দিনীরা

বাতাসে এখনও শিরশিরে ঠান্ডা, দিনের বেলায় না লাগলেও রাতের দিকে গায়ে গরম পোষাক চাপাতে হচ্ছেই। দুধের সরের মতো কুয়াশা এখনও আকাশের গায়ে লেপ্টে রয়েছে। এর মাঝেই বেশ ঘটা করে পালিত হয়েছে মাতৃভাষা দিবস, এ শহরেও। বাঘাযতীন পার্কের ভাষা শহীদ মিনারের সামনে বিভিন্ন সংগঠন তাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে বিভিন্ন ভাবে, যোগদান করেছে করেছে সাধারণ মানুষ এবং সান্ধ্যকালীন বিচিত্রায় যথারীতি শোকদিবসটি উৎসব-কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, শিলিগুড়ি বর্তমানে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাসস্থান। গুরুমুখী, হিন্দি, নেপালি, গুজরাতি, ওড়িয়া, মালয়ালম, অহমিয়া প্রভৃতি ছাড়াও চীনা ভাষাতেও কথা বলেন এই শহরের অনেক বাসিন্দা। বিভিন্ন ভাষার মানুষ নিজ নিজ কর্ম প্রয়োজনে এই শহরে বাস করছেন, সুতরাং শহরটি শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যর দিক থেকেও সমান গুরুত্ব দাবি করে।

এ শহরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান স্ব-মহিমায় মন্ডিত, ধারাবাহিকভাবে নিজেদের কৃষ্টি সৃষ্টি ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। সুতরাং প্রচলিত ধারণা 'বাণিজ্য কেন্দ্র শিলিগুড়ি সংস্কৃতিমন্ডিত নয়'—এটি সম্ভবত ভুল। সম্প্রতি শহর হারিয়েছে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জগতের দুই প্রবাদ-পুরুষকে। প্রয়াত হয়েছেন অশ্রুকুমার সিকদার, শুধু শিলিগুড়ি বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, যিনি স্বনামে পরিচিত এই দেশের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে। অপর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সমর চক্রবর্তী। দু'জনই অধ্যাপক, দু'জনই ভাষা-জগতের দুই প্রবাদ পুরুষ। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই শহর শিলিগুড়ির শিক্ষা-সংস্কৃতির জগত প্রতি মুহূর্তে এঁদের অভাব অনুভব করবে।

ফাল্গুন-চৈত্র বাসন্তী রঙে মন্ডিত আর পাশাপাশি মার্চ মাসটি উল্লেখ্য নারীদিবসের জন্য। শহর শিলিগুড়ির নারীরা কেমন আছেন প্রশ্ন করলে উত্তর এটাই হবে —আর পাঁচটি কসমোপলিটন শহরের নারীরা যেমন থাকেন তেমনই। যদি একটু পিছিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে ঘরের আগল ঠেলে বেরিয়ে এসেছেন অনেক নারী, জীবিকার প্রয়োজনে, আজ তাঁদের অনেকেই স্বনামে খ্যাত। খেলাধুলোর জগত, শিক্ষাজগৎ,সরকারি অথবা বেসরকারি কর্ম প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য-নাট্যচর্চা-বাচিক শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রে শহর শিলিগুড়ির নারী সমাজ নিজেদের মেলে ধরেছে। এই শহরে বেশ কিছু নারী সংগঠন আগেও ছিল এখনও আছে। বরং আগের চেয়ে আরও সক্রিয় হয়েছে সামাজিক দায়িত্ব পালনে, দাঁড়িয়েছে মানুষের পাশে মানুষকে ভালোবেসে। এমন একটি সংস্থা 'ফুলেশ্বরী নন্দিনী', বাংলাদেশ-নন্দিনীর একটি শাখা সংগঠন ফুলেশ্বরী বয়সে কিশোরী হলেও নিজের কর্মজগৎ প্রসারিত করেছে। শুধু সমাজসেবার ক্ষেত্রে নয় এদের বিচরণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতেও, সেখানেও তারা সাফল্য বজায় রেখেছে। রয়েছেন ব্যবসায়ী মহলে সফল, স্বনামে পরিচিত বহু নারী। রয়েছেন বেশ কিছু নারী সম্পাদক, নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলি যে শুধুই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে তা নয়, শহর শিলিগুড়ির নামও উজ্জ্বল হয়েছে তাদের সম্পাদনার মাধ্যমে।

টিম ফুলেশ্বরী নন্দিনী

এভাবেই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখুক শহর। পাশাপাশি দুর্বল জায়গাগুলিও সারিয়ে তুলুক নিজেদের অসুখ। সেইসব দুর্বল জায়গাগুলিও উঠে আসবে ধারাবাহিকভাবে ডায়েরির পাতায়, শুধু ছিদ্র দেখিয়ে দিতে নয়, ছিদ্র সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও সহযোগী হয়ে উঠবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর এই কলম।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

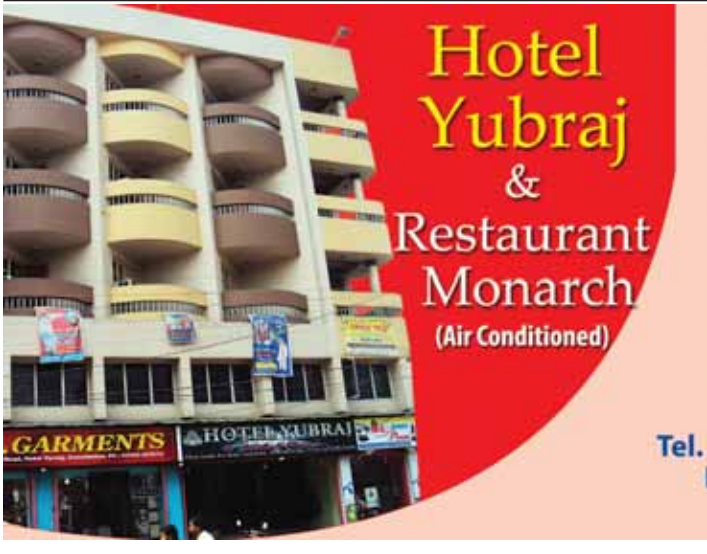

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

রাসায়নিক রস

মহাদেবের মন ভাল নেই

মহাদেবের মেজাজ খিচড়ে রয়েছে ঘুম থেকে উঠেই। ছাই দিয়ে দাঁত ঘষে মুখ কুলি করতে গিয়েই টের পেলেন, গলার কাছে একটা টক ঢেউ এসে কিঞ্চিৎ জ্বালিয়ে দিয়ে পাইলে গেল যেন। এই হয়েছে পোব্লেম, অ্যাসিডিটি ভয়ংকর বেড়ে গিয়েছে আজকাল। উল্টোপাল্টা কিছু খেয়েছ কি মরেছ! প্রথমবার যেবার দেবতাদের রিকোয়েস্টে এক সমুদ্র নোনা তেতো জল খেয়ে ফেলেছিলেন সেবার একটাই লাভ হয়েছিল, অম্বলের জ্বালা যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল শরীর। কিন্তু ইদানীং যেটা হয়েছে মন্তে নামলেই ভক্তদের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে উল্টোপাল্টা অনেক কিছু গিলতে হয় যা আর শরিলে সুট করে না। এমনকী দুধও সহ্য হয় না। তাই তো আজকাল ভক্তদের বলেন, দুধ ঢালবার দরকার নেই মা, ও তোমরা পলিপ্যাকেই রেখে যাও, পরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে দুধ-চা করে খেও। কেষ্টকে ননী বানিয়ে খাইও। বড় বড় ভক্তরা শুনে মাথাটাথা চুলকে বলেছে, বাবা ও রোগে তো আমরা কমবেশি সবাই ভুগি, আপনি বরং হায়দরাবাদ বা চেন্নাই গিয়ে একবার দেখান। ধুস শালা, মহাদেব রেগে গিয়ে ভেংচি কাটেন।

যেতে হবে ডুয়ার্সে, শিবরাত্রির সময়ে ওদিকটাতেই যান প্রত্যেকবার। জল্পেশ জটিলেশ্বর বাণেশ্বর — এ সময়টা আবহাওয়া চমৎকার থাকে সেখানে। পাহাড়ে বরফ গলে গিয়ে গুরাস ফুটবার সময় এসে যায়। ঘুঘুমারিতেও তোর্সা চরে এবার মেলার পঁচিশ বছর, সেখানেও যেতে হবে একবার! কিন্তু মুশকিলটা হল এবার উত্তরবঙ্গে বড্ড ধুলো। দেশের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট সামনেই। ফলে ঝড়ের গতিতে তৈরি হচ্ছে বা মেরামত হচ্ছে বা চওড়া হচ্ছে রাস্তা সেতু। নদী থেকে টন টন বালি নিয়ে গিয়ে ফেলছে বড় বড় ট্রাক। কোথাও তকতকে লম্বা রাস্তা, চলতে চলতে হঠাৎ ডাইভারসন, বিশাল খাল খুঁড়ে তৈরি হচ্ছে নতুন কালভার্ট। চারিদিকে যেন কোনও যুদ্ধের সাজ সাজ রব। ফলে পশ্চিমের হাওয়ায় ডুয়ার্স জুড়ে ধুলোর ঝড়। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নেতাদের মুখে মিথ্যে কথার ফুলঝুড়িতে ছোটা থুতুর ঝড়। নদীর পারে ভুটান সীমান্তের সিমেন্ট কারখানা থেকে ছড়িয়ে আসা ধুলোর ঝড়। ঝড়ের দাপটে নাজেহাল ছাপোষা মানুষ কোনওক্রমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটো খাওয়ার সংস্থান করেই নাক মুখ গুঁজে ঢুকে পড়ছে ঘরে। সন্ধে হলেই বাইকের ভিড়ে বাজার এলাকায় যাওয়া দায়। যুব সন্তানেরা কারণবারির উৎসব চালু করে দেয়। ঝুপড়ি পানের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় পেলাস্টিকের গেলাস ও মিনারেলের বোতল। শালা আলাদা করে পানশালার প্রয়োজনটা কী?

ডিনারের পর মহাদেব নন্দী ভৃঙ্গিকে অন্তরঙ্গ আড্ডায় বলছিলেন, বুঝলি! অনুমান করছি শিগগিরি আবার সমুদ্রের জল গেলার রিকোয়েস্ট আসবে সগগো থেকে। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, কোটি কোটি সন্তান রোজ মদ খেয়ে যে হারে অ্যালকোহল মুতছে তা নদ্দমা বেয়ে নদীতে আর নদী বেয়ে সাগরে এসে পড়ছে। তার ওপর রয়েছে কৃষি বিপ্লব আনতে লক্ষ লক্ষ গ্যালন পেস্টিসাইড। সব তো সাগরেই এসে পড়ছে, পড়ছে কি না বল? দুয়ে মিলে যে লেভেলের গরল তৈরি হচ্ছে তা পান করে শহীদ হবে কোন গাড়ল বলতো?

ডিনারের পর মহাদেব নন্দী ভৃঙ্গিকে অন্তরঙ্গ আড্ডায় বলছিলেন, বুঝলি! অনুমান করছি শিগগিরি আবার সমুদ্রের জল গেলার রিকোয়েস্ট আসবে সগগো থেকে। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, কোটি কোটি সন্তান রোজ মদ খেয়ে যে হারে অ্যালকোহল মুতছে তা নদ্দমা বেয়ে নদীতে আর নদী বেয়ে সাগরে এসে পড়ছে। তার ওপর রয়েছে কৃষি বিপ্লব আনতে লক্ষ লক্ষ গ্যালন পেস্টিসাইড। সব তো সাগরেই এসে পড়ছে, পড়ছে কি না বল? দুয়ে মিলে যে লেভেলের গরল তৈরি হচ্ছে তা পান করে শহীদ হবে কোন গাড়ল বলতো? বেসামাল নন্দী-ভৃঙ্গি খ্যাক খ্যাক হাসে, তবে যাই বলো না কেন বাবা, ডুয়ার্সে কিন্তু তোমার হেব্বি কদর!

বেসামাল নন্দী-ভৃঙ্গি খ্যাক খ্যাক হাসে, তবে যাই বলো না কেন বাবা, ডুয়ার্সে কিন্তু তোমার হেব্বি কদর! মানে সেই সঙ্গে আমাদেরও! এবার উদাস হয়ে যান মহাদেব, দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, কোথায় আর সে কদর রে বাপ! এখন দেখিস না গণেশকে নিয়ে কেমন আদিখ্যেতা সেখানে! বাপের জন্মে শুনেছিলি? কোটি কোটি খচ্চা করে গণেশ চতুর্থী হয় এখন! মহারাষ্ট্রের জনগণও নাকি খোঁজখবর নেয় আজকাল। বড়ছেলেকে একদিন দুঃখ করে বললেম, তো সে দুহাতে পেট চুলকে বলে কি জানিস? ও কাম অন পিতাশ্রী, নিউ জেনারেশন আমাকে চাইছে, আমি কী করব বলো? অথচ দ্যাখ, এত সাজগোজ করেও কেতোটা কিস্যু করতে পারল না। আর তার সঙ্গে জুড়েছে হনুমান হতভাগা! তারও তো এখন ওই এলাকায় পিঠে ভাগের ভালই পসার! শুনি তো আজকালকার মেয়েরা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে না, পাঠ করে হানুমান চালিসা।

মহাদেব সেদিন ভীষণ মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। নাক ডাকাচ্ছিলেন। নন্দী এসে ডাকলে ঘুম ভাঙল, দুটো ফোন এসেছিল। একটা ব্রহ্মস্যারের, আরেকটা দেবলোক মন্ত্রীসভা থেকে, তোমায় ইচ্ছে করেই ডাকি নি। চলো ওঠো ট্রেনের টাইম হয়ে এল, আমরা রেডি। ভৃঙ্গি মজা করে বলে উঠল, এবার ওখানে তোমায় টোটোয় চাপাবই চাপাব। মহাদেব একটা ঢেঁকুর তোলা হাসি হেসে বললেন, না রে চল, মানষীগুল্যান অপেক্ষায় আছে ওখানে। এখন আর কোনও ফোন এলে ধরিস না। এখন ডুয়ার্স।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬
শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর**, আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-12 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

ডুয়ার্সের বইপত্র বাড়িতে বসে পেতে চান?

রহস্য-রোমাঞ্চ-রুদ্ধশ্বাস তিন পেপারব্যাক থ্রিলার

একত্রে অর্ডার দিলে ~~২৯৫ টাকা~~ ২০০ টাকায় বাড়িতে বসে পেতে পারেন

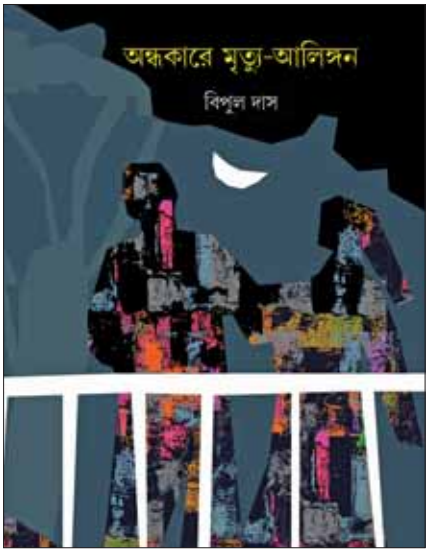

বিপুল দাস
অন্ধকারে মৃত্যু আলিঙ্গন

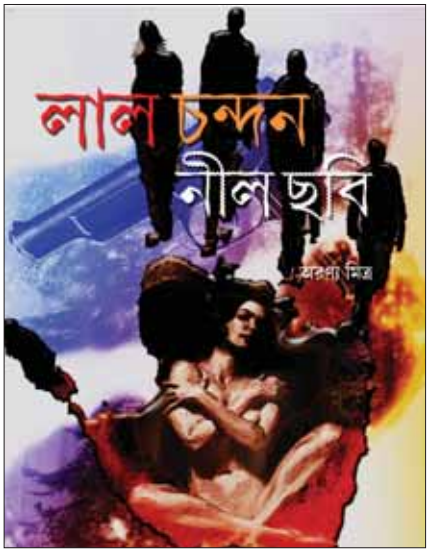

অরণ্য মিত্র
লাল চন্দন নীল ছবি

সাগরিকা রায়
শালবনে রক্তের দাগ

ডুয়ার্সের সেরা উপন্যাসের বই

একত্রে অর্ডার দিলে ~~৫১৫ টাকা~~ ৩০০ টাকায় বাড়িতে বসে পেতে পারেন

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
তরাই উতরাই
১৬৫ টাকা

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মেঘের পর রোদ
৫৫ টাকা

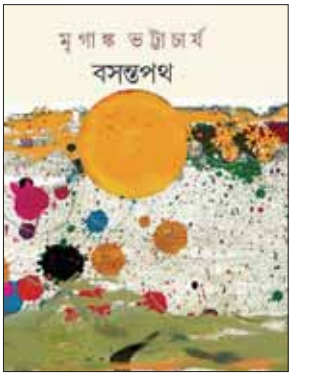

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
বসন্তপথ
১০০ টাকা

সংকলন
ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
১৯৫ টাকা

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.